প্রখরা।

(উপন্যাস)

শ্রীবিধুভূষণ বসু প্রণীত।

প্রকাশক—
শ্রীগোবিন্দ সাহিত্য মন্দির
২৩৷১, হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা।
১৩৩৫।

মূল্য ১৷৹ পাঁচসিকা।

প্রকাশক—শ্রীশরৎকুমার হোড়,
শ্রীগোবিন্দ সাহিত্য মন্দির।
২৩।১, হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ

প্রিণ্টার—শ্রীশরৎকুমার হোড়
শ্রীগোবিন্দ প্রেস,
২৩।১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

পুত্র-তর্পণ।

স্বণ,

তুই প্রখর ভাবেই এসেছিলি, জীবনের মধ্যাহ্ন না হতেই প্রখর ভাবেই চলে গেলি। কিছু দিয়েও গেলি না, কিছু নিয়েও গেলি না। প্রখরার খাতাখানা পড়ে তোর নাকি বড় ভাল লেগেছিল। সেই প্রখরা দিয়াই তোর অতৃপ্ত আত্মার তর্পণ করিলাম।

১ শে অগ্রহায়ণ,
১৩৩৫।

পুত্র-শোকাহত পিতা

উপহার।

শ্রী

কে

প্রদত্ত হইল।

তাঃ

শ্রী

মর্ম্মকথা।

নারীত্বের অবজ্ঞা বর্ত্তমান অবনত রুগ্ন ভারতের একটা বড় ব্যাধি। এই প্রখর সত্যটা হৃদয়ে জাগিয়াই আমাকে প্রখর করিয়া দিয়াছে। স্বয়ম্বরায়ই এই প্রখরতার সূত্রপাত হইয়াছিল, "বিষের বাতাস" "দীপালীর বাজিতে" তাহা দমে নাই, "প্রখরায়" আরও জ্বলিল। "কুলের বলি" "জ্যাঠাইমা"ও এই প্রখরতারই পরিচয় দিবে। জীবনের স্তিমিত অপরাহ্ণ বটে, তবু মাতৃজাতির শোচনীয় অবজ্ঞা আমাকে প্রখর উন্মাদই করিয়া দিয়াছে। মানুষ যদি মা'কে সম্মান করিতে না শিখে তবে মাতৃভূমির কল্যাণ চিন্তা তাহার পণ্ডশ্রম।

নারী ত কেবল হাসি, রূপ, গানেরই ব্যাপারী নয়, কেবল দাসীত্বই তাহাদের জীবনের প্রয়োজন নয়। সৃষ্টির সার শক্তি মাতৃত্ব,—স্নেহ-প্রীতিভারেই নারী গরীয়সী, যে সমাজ এ সত্য মানে না, তাহার দুর্গতি দূর হইবার নহে।

২০শে অগ্রহায়ণ, }
১৩৩৫। বিষ্ণুপুর }

গ্রন্থকার।

প্রখরা।

(১)

মরা ভৈরবের কূলে বড় একটা গ্রাম, অনেকগুলি ঘর বাড়ী দালান কোঠা ;—সকলই পুরাতন অসংস্কৃত, বাড়ীর উঠান পর্য্যন্ত জঙ্গলে ঢাকা। এত বড় নাম ভৈরব, তার অবস্থাও যেমন পড়্‌তি, এত বড় গ্রামটার অবস্থাও তেমনি পড়্‌তি। গ্রামের অধিবাসীরা এখন আর বড় গ্রামে বাস করেন না। সকলই ভদ্রলোক, লেখা পড়া শিখিয়া বিদ্বান হওয়া তাঁদের কুলধর্ম্ম, সুতরাং চাকরীই পেশা। সকলকেই চাকরী করিতে বিদেশে থাকিতে হয়; দেশ গাঁয়ে আসা বড় ঘটিয়া উঠে না। বিধবা পিসী, ভগিণী, জ্যাঠাইমা, কাকীমা কদাচিৎ কোনও মাতা গ্রামের বাড়ীতে থাকিয়া ভিটায় প্রদীপ জ্বালেন। মাঝে মাঝে দুই এক জন চাকরী না পাইয়া বা পাইয়াও রাখিতে না পারিয়া মর্ম্মে মরিয়া গাঁয়ে বাস করেন। তাঁদের অন্ন-বস্ত্রের বড় কষ্ট।

ঐ গ্রামের রায় বাড়ী খুব বড় বাড়ী, চক আটা দালান কোঠা। সদরে--খিড়কিতে সান বাঁধান পুকুর, নাকারী নাট মন্দির ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, মণ্ডপের ছাদে জল পড়ে, এখনও পড়িয়া যায় নাই। সে বাড়ীতে দুই

বুড়ী, একজন গোমস্তা ও একজন চাকর সর্ব্বদা বাস করে; বাড়ীর লোক অনেক চাকুরে, দেশ গাঁয়ে আসা প্রায়ই ঘটে না। আজ কয়েক দিন এ বাড়ীটা ছাপ ছাপাই করার খুব ধূম পড়িয়াছে। এই বাড়ীর বিনয়বাবু জজকোর্টের উকিল, তাহার কন্যার বিবাহ। তিনি কন্যার বিবাহ দিতে বাড়ীতে আসিতেছেন। বিনয়বাবু দু'তিন বৎসর অন্তর বাড়ীতে আসিয়া থাকেন। গ্রামের উপর তাহার টান আছে।

বিনয়বাবু সপরিবারে বাড়ী আসিলেন। যে কন্যার বিবাহ, তাহার নাম মৃণালিনী। সকলে ডাকিত মিণী বলিয়া। মিণী আজ দু'বৎসর পরে তাহাদের আম-কাঁটাল-তাল-তেঁতুলের ছায়া ঢাকা পল্লী ভবনে আসিয়া তাহার ভাবী বিবাহের আনন্দ অপেক্ষা পল্লীবাসের শান্ত মধুর স্পর্শকে যেন অধিকতর উল্লাসকর বলিয়া বড় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। পার্শ্বের বাড়ীতেই তাহার বড় ভালবাসার সঙ্গিণী শলী বা শৈলবালাদের বাস। মিণী বাড়ী না ঢুকিয়াই শৈলদের পথের পরের আমগাছ তলায় গিয়া ডাকিল, "শৈ! শলী!" শলী ভাত খাইতেছিল, মিণী আসিবে জানিয়া সে এতক্ষণ না খাইয়াই পথে আনাগণা করিতেছিল. বিলম্বে, এ বেলায় আসিবে না ভাবিয়া এই সবে খাইতে বসিয়াছিল; মিণীর ডাক শুনিয়া এটো হাতেই ছুটিয়া আসিল। শলী মিণীর মুখ-পানে চাহিয়াই বলিল, "তোদের এখনও খাওয়া হয়নি?"

"এই সবে এলুম!" বলিয়া মিণী শৈলর এটো হাতটাই ধরিয়া ফেলিল।

"আহা, এটো হাত যে!" বলিয়া শৈল সেই হাতেই মিণীর হাত ধরিয়া লইয়া তাহাকে তাহার আধ খাওয়া ভাতের থালায় বসাইয়া বলিল, "যখন হাত এটো করেছিস, তখন কি অমনি মুখে থাকবি?" শৈলর মা আরও ভাত তরকারী পরিবেশন করিলেন। তাহারা দু'জনে

হাসা হাসি কাড়া কাড়ি করিয়া কত আনন্দে এক থালায় বসিয়া খাইল ! আহারান্তে শৈল বলিল, "আর বোধ হয়, তোর সঙ্গে এমন এক পাতে খাওয়া হবে না, তুই ত বরের বাড়ী চ'লে যাচ্ছিস্ ।"

মিণী শলীর গালে এটো হাতেই চড় মারিল ; "বেহায়া মেয়ে ! মায়ের সামনে তামাসা !"

আহারান্তে দুজনে পুকুরে গিয়া হাত ধুইল। পুকুর পাড়ে আম গাছে সেবার খুব আম ধরিয়াছিল। বৈশাখের প্রথম, আম তখনও পাকে নাই। মিণী বলিল, "এবার আম না পাক্‌লে কিছুতেই বাড়ী থেকে যাব না। কত কাল আম কুড়িয়ে খাই না।" তার পর দুজনে আমতলায় বসিয়া গল্প আরম্ভ করিল। মিণীর বিবাহের কথা লইয়া গল্প। বরের কথা, বরের বিদ্যার কথা, ধন মানের কথা, পণ, গণ, সজ্জা, অল ার সকল কথাই হইল। তার পর মিণী বলিল,—

"তোর বিয়ের কি হচ্ছে ভাই শৈ ?"

"এখনও কিছু হচ্ছে না।"

"পাড়াগাঁয়ের লোক, বিয়ের বয়স যাচ্ছে বলে কিছু বলে না ?"

"বলে না ? আজ একবছর ত আমি ঘরের বার হই না। বাবা কত চেষ্টা কচ্ছেন, কোথাও যোটাতে পাচ্ছেন না। ভাই, মেয়ে হয়ে জন্মটা কি পাপ !" শলীর মুখ বিষণ্ণ হইল !

"এমন সুন্দর মুখখানি এখনও কারু চ'কে পড়্‌লোনা !" বলিয়া মিণী শলীর চিবুক ধরিয়া নাড়া দিল। অতঃপর দু'জনে রঙ্গে, সরলে, তরলে গম্ভীরে কত কথাই হইল। শৈলর পিতা দরিদ্র, জমিদারের তহসিলদারী করিয়া খড়ের ঘরে ও মোটা ভাত কাপড়ে পরিবার প্রতিপালন করেন। যথেষ্ট টাকা দিয়া জামাতা কিনিতে পারিতেছেন না। মিণীর পিতা উকিল, বিস্তর টাকা রোজগার করেন, পাঁচ হাজার

টাকা নগদ পণে জামাতা মিলাইতেছেন। এই কথা লইয়া গম্ভীর আলোচনা হইল। মিণী সহরের শিক্ষিতা মেয়ে তাহার পিতা তাহাকে স্কুলে পড়াইয়াছেন, গৃহে শিক্ষক রাখিয়া কন্যাকে সুন্দররূপ শিক্ষা দিয়াছেন। মিণীর সংস্কৃত পড়িতে বিশেষ আগ্রহ, এজন্য বর্ত্তমানে একজন পণ্ডিত তাহাকে ব্যাকরণ শিখাইয়া শাস্ত্রাদি শিক্ষা দিতেছেন।

মৃণালিনী শৈলবালা অপেক্ষা কিছু বয়ঃজ্যেষ্ঠও হইবে। তাহার শরীরের গঠন শৈলবালার চেয়ে অনেক পূর্ণায়তন; ভাব ভঙ্গিমায় সে বিশেষ গম্ভীর, বুদ্ধিতেও অনেক প্রখরা। তবে রূপে শৈলবালার চঞ্চল তরল লাবণ্যচ্ছটার কাছে সংস্কার মার্জ্জিতা প্রগল্‌ভা মৃণালিনী যেন কিছু খাটো হইয়াই পড়িবে! মৃণালিনী তাহাদের রঙ্গালাপ গম্ভীরে নামাইয়া বলিল, "পুরুষেরা যত বিদ্বান হচ্ছে, ততই যেন টাকার কাঙ্গাল হচ্ছে। মেয়েরা যাবে তাদের জীবন বিকেয়ে দাসী হ'তে, সঙ্গে চাই ৫।৭ হাজার টাকা দক্ষিণা। এটা মনে হলে কিন্তু ভাই আমি আর পুরুষকে তেমন মেনে চল্‌তে পারি না।"

তখন পরিচারিকা আসিয়া ডাকিল, মৃণালিনীর যেন হুস হইল, এতক্ষণে সে বাড়ীতে ঢুকে নাই। সকলে জানি তাকে কত খুঁজেছেন। অপরাধীর মতন লজ্জা আসিয়া তার মুখে ভর করিল। শৈলর আঁচল টানিয়া বলিল, চল্ আমাদের বাড়ীতে। তুই আমার দেড় বছরের ছোট, বিয়ের জন্য এত ব্যস্ত কি?"

শলী মিণীকে চিম্‌টী কাটিয়া বলিল, "ইস্! দেড় বৎসর নয়? এক বৎসরেই।"

"তা হলোই বা,—তোকে আমার ছোট বোনের চেয়ে ছোট দেখায়! এখনও তোর বুকে কাপড় আটকায় না। তুইত খুকী!" বলে মিণী শলীকে টানিয়া লইয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিল।

(২)

সে দিন শৈল মিণীদের বাড়ীতেই কাটাইল! সে বাড়ীতে সে দিন কেবল উৎসাহ, উল্লাস, আনন্দ! আগামী কাল পাকা দেখা ও গায়ে হলুদ—তার চার দিন পরে বিয়ে! রাত্রিতে সকলে বসিয়া রঙ্গ তামাসা হইতেছে, এমন সময়ে সংবাদ আসিল, কাল পাকা দেখা হইবে না। বর পাত্র নিজে কন্যা না দেখিয়া, সম্বন্ধ পাকা করিতে সম্মত নন। আর যৌতুকাদি যাহা দেওয়া হইবে, তাহার সঙ্গে একখানা বাইসিক্‌ল না দিলে জামাই কিছুতেই এ বিবাহে রাজি হইবেন না। এটা তাঁর পণ। আগামী কাল চারিটার সময়ে তিনি একজন বন্ধুর সঙ্গে কন্যা দেখিতে আসিবেন। আধ ঘণ্টা মাত্র নিভৃতে বসিয়া কন্যার সঙ্গে আলাপ করিয়া যাইবেন।

সংবাদ শুনিয়া সকলেই একটু বিমনা হইলেন। আজকাল কন্যাদায় উদ্ধারের মতন বৃহৎ ব্যাপার ভদ্র সমাজে আর নাই; তাহাতে কোনও রূপ ব্যতিক্রম ঘটিলে বিশেষ মনোভঙ্গেরই কারণ হয়। দশ পাঁচ মিনিট সকলেই যেন নির্ব্বাক হইয়া রহিল। শৈলবালা সে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিল, "পাঁচ হাজার টাকা নগদ, আরও গয়না বর সজ্জায়ও আর পাঁচ হাজার, তা আবার মেয়ে বাছাবাছি কি?" সকলেই তার প্রতিধ্বনি করিল, "বটেইত! এখনকার ছেলেগুলি কি বেয়াদব! বাপ খুড়া দেখে শুনে ঠিক করেছে, তারা আবার নিজে দেখ্‌তে হবে!" শৈল এবার মিণীর পিঠে একটা কিল মারিয়া বলিল, "বাবু আধ ঘণ্টা আলাপ করে সব পরীক্ষা করে যাবেন।" ঝিটা ছিল খুব মুখরা, সে বলিল, "তা আসুন না। দিদিমণি যদি একবার তাঁর পটলচেরা চোকে

তেমনি একটা চাহনি ছেড়ে দেন, তবে এমন মিন্‌সে দেখি না যে এক ঘণ্টার মধ্যে মাথা ঠিক ক'রে নেবে।" মিণীর মা বলিলেন, "তা আসুন না দেখে যাউন, মেয়ে ত আমার কুরূপা নয় যে এত বাহানা! মেয়ে সন্তান পেটে ধর্‌লে কতই যে সইতে হয়!"

মৃণালিনীও সেখানে ছিল। তাহার মুখমণ্ডল যেরূপ গম্ভীর, দৃষ্টি যেরূপ অচঞ্চল, তাহা বয়সের, সময়ের, ও ঘটনার পক্ষে নিতান্ত বেখাপ বলিয়াই বোধ হইতেছিল। শৈল বলিল, "আহা! মিণীর মুখখানি যে আঁধার হ'য়ে গেল।" ঝি বলিল, "দিদিমণি, ছাদের কড়ি গণছেন।" সতের বছরের মেয়ে এ অবস্থায় হাসি চাপিয়া রাখিতে পারে, এরূপ আখ্যান কেহ কখনও শুনে নাই। শৈল আবার বলিল, "ভাবনা কিসের? এমন করে সাজিয়ে দেবো যে, মিন্‌সের মাথা ঘুরে যায়।" বড় রুক্ষ নজরে মৃণালিনী শৈলর দিকে চাহিল, তারপর ছোট করিয়া বলিল, "চল্ ঐ ঘরে।"

দুইজনে গৃহান্তরে গেল। মৃণালিনী বলিল, "শৈল! নারীত্বের এমন অবজ্ঞা!" তাহার দৃষ্টি কঠোর, মুখভঙ্গি গম্ভীর! কণ্ঠস্বর কোমলতা-মাত্র পরিশূন্য, অতি দৃঢ়; শৈল কিছুই বুঝিল না, মিণীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। তবে তাহারও ভাবান্তর ঘটিল, রঙ্গকৌতুক লুকাইল। মৃণালিনী আবার বলিল, "শৈল! তুই যথার্থই বলেছিস্, দশ পাঁচ হাজার টাকার চুক্তি যাদের কাছে আগে, তারা আবার রূপ গুণ কি বাছাই কর্‌বে? ওসব কিছু নয়। আর কিছু টাকা নেবার ফন্দি মাত্র। এত অপমান সয়ে নারীজাতি কোন্ সুখের আশায় সংসারে মাথা দেয়! কোন নারী তার সারাজীবনটা এত বড় হীন পুরুষের সুখ সুবিধায় সঁপে দিয়ে সংসারের ষোল আনা যাতনা মাথা পেতে নেয়? এমন পুরুষের গৃহিণী হ'তে যায় নারী কোন প্রলোভনে?"

এত কথায়ও শৈল যেন বড় একটা কিছু বুঝিল না, বলিল, "তুই বই পড়ে পড়ে কত বিদ্যে শিখেছিস, তাই বুঝি জাহির কর্ত্তে লাগ্‌লি।"

মৃণালিনী শৈলের হাত ধরিয়া আরও কাছে টানিয়া লইল, তারপর বলিল, "শৈল, আমোদ প্রমোদ রাখ্। এ সময়ে তোর রঙ্গ কৌতুক আমার কাছে বিষ লাগ্‌ছে। শোন্, আমরা বালিকা, তথাপি একথাটা কি আমরা স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারি না, পুরুষ নারী জাত্‌কে কত ছোট বলে মনে করে! পুরুষ সারাজীবন যাকে সঙ্গে নিয়ে সংসারের পথে ঘুর্‌বে, যার উপর তার জীবনের ষোল আনা সেবা-সুবিধার ভার চাপিয়ে চল্‌বে, প্রথমেই তাকে কত অপমান অবজ্ঞা দিয়ে, যেন নেহাৎ সোণারূপার প্রলোভনে তাকে পার্শ্বে স্থান দেয়! সত্যি বল্‌ছি, দশ মিনিট আগেও আমার মনে কেন এভাবটা আসে নাই, তাই ভেবে আমি ম'রে যাচ্ছি! তোমার কথায় আমার চোক্ ফুটেছে শৈল। যাই হোক, আজ তোমায় আমায় মিলে পুরুষের সঙ্গে কিছু বোঝা-পড়া কর্‌বো। আমি যা বল্‌বো তা তোমায় কর্ত্তে হবে, আমার শপথ!"

শৈল এতক্ষণে ব্যাপারটা কতক বুঝিয়াছে। বলিল, "কি কর্‌বে ভাই!"

"কি কর্‌বো? যা কর্‌বো, তা……খুব শক্ত বটে, কিন্তু কর্‌বোই! আমি শপথ কচ্ছি, সোণা রূপা নিয়ে আর পুরুষের কাছে জীবন যাচাই কর্ত্তে যাব না।"

"বল কি? তার পর?"

"তারপর আবার কি? যতদিন বেঁচে থাক্‌বো, স্বাধীন স্বচ্ছন্দ প্রাণে পুরুষের সঙ্গে আড়ি দিয়ে চল্‌বো।"

"তা কি কখনও মেয়ে মানুষে পারে?"

"কেন পার্‌বে না? আর সকল দেশেই পারে, কেবল এই হিন্দুর

দেশটায় পারে না। আমি এই পারা-পারি নিয়ে একটু খেলে দেখ্‌বো। আমার প্রতিজ্ঞা, সামান্য সখের লোভে ভুলে সারাজীবন দাসী হয়ে, এক কুড়ি ছেলে মেয়ের বোঝা মাথায় নিয়ে জীবনটা পচিয়ে গলিয়ে ফেল্‌তে আমার আর প্রবৃত্তি নাই। যা'ক সে কথা, আমি যা বল্‌বো, তোর তাই কর্ত্তে হবে! তুই আমার ছোট বোন্‌,—তোর পায়ে পড়ী, কর্‌বিত ?"

"ছি! ভাই, তোমার বড় বাড়াবাড়ি। তুমি যা বল্‌বে, তাই কর্‌বো।"

তারপর ত্ব'জনে অনেক কথা হইল। শৈল সে দিন মিণীদের বাড়ী-তেই রহিল। মিণীর সঙ্গে একত্রে খাইল, একত্রে শুইল। মৃণালিনীর এখন আর সেরূপ ভার ভার ভাব নাই। মন যেন খুব পাতলা, নিঃসন্দেহ, নির্ভয়! রাত্রিতে শুইয়া মৃণালিনী শৈলকে অনেকগুলি কথা বলিল। শুনিয়া শৈল একবার উঠিয়া বসিল, বলিল, "বলিস্‌ কি! এও কখনও পারা যায় ?"

"পারা যায়। পার্ত্তে হবে। পার্লে পুরস্কার পাবি, সেই বরের সঙ্গে তোর বিয়ে দেবো।"

"তোর বরের সঙ্গে ?"

"আমার আবার বর কি ? আমি যে ও জিনিষটা আজ ঠাকুরের পায়ে দিলাম। শোন্‌, আজ সব বুঝে নিয়ে ঠিক হয়ে থাক্‌তে হবে।"

তারপর কথা হইল অনেক। রাত্রি ভোর হইতে যায়! মিণী ঘুমাইয়া পড়িল, শৈলের ঘুম আসিল না।

---

(৩)

সজ্জা-সৌষ্ঠবের আড়ম্বরে সুগন্ধ সম্ভারে সুবাসিত হইয়া মৃণালিনীর ভাবী বর নলিনীরঞ্জন—এম, এ, ক্লাসের ছাত্র, তাঁহারই মতন একজন সঙ্গী সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সাড়ে চার বাজ্‌তে পাঁচ মিনিট মাত্র বাকী। আগমনের পরক্ষণে,—যখন স্বাগত সাদর সম্ভাষণের পশরা নিবৃত্ত হইতে পারে নাই, তখন সঙ্গের বাবুটী বলিলেন, সময় অল্প, এই পাঁচটারই ফিরতে হবে। উভয়েই—হাতে বাঁধা ঘড়ি! হাত ফিরাইয়া দেখিয়া লইলেন। পাখীর মতন উড়িয়া পড়িয়া চলিয়া যাইতে সকলেই আপত্তি তুলিলেন বটে, কিন্তু নিষ্প্রয়োজনে নষ্ট করিবার মতন সময় শিক্ষিত ভদ্রলোকের থাকিতে পারে না, একথায় তর্ক চলিতে পারে না। আগে কন্যা দেখা, তারপর জলযোগের ব্যবস্থা স্থির হইল।

মৃণালিনীকে সাজাইতে গেলে মৃণালিনী দৃঢ়কণ্ঠেদৃপ্ত ভঙ্গিমায় কহিল, "কিছুতেই নয়! সেজে গুজে আবার কি দেখাব? শৈল মাত্র আমার সঙ্গে থাকবে। আর কেউ থাকতে পারবে না। সঙ্গে আর একজন কে এসেছে, সে কিন্তু আস্‌তে পার্‌বে না। এ আমার কিন্তু প্রতিজ্ঞা!"

মৃণালিনীর কথার ভঙ্গিমা ও চোক মুখের ভাব দেখিয়া সকলে যেন আহত হইল, বিরক্তও হইল; কিন্তু গত্যন্তর নাই। সেইরূপই আয়োজন হইল।

একটা কক্ষে মিণী ও শলী গিয়া বসিল। কাহারও অঙ্গে বিশেষ কোনও আভরণ নাই। এলো চুল, আট পৌরে দুখানি সাড়ি মাত্র পরা। নলিনীরঞ্জন সে গৃহে প্রবেশ করিলেন। তখনই মিণী দরজার খিলটা

আটকাইয়া দিল। বসিবার আসন ছিল, যুবক বসিলেন। দু'মিনিট কেহ কোনও কথাই বলিল না। নলিনীরঞ্জন একটু ব্যাকুবের মতনই বালিকাদ্বয়ের পানে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা চাপিয়া চাপিয়া একটু একটু হাসিতেছিল, আর এমন হাসিবার সময়ে ইহাদের চক্ষুতারা যে কেমন একভাবে ভাসিয়া ভাসিয়া খেলিতে থাকে, যাহাতে পুরুষের দিন রাত ভুল হইয়া যায়, তাহা বালিকাদ্বয়ের ইচ্ছাকৃত না হইলেও, স্বভাব বশে এমনি ফুটিয়া উঠিল যে, এত বড় পূর্ণাবয়ব যুবক আপনাকে নিতান্ত অসহায় মনে করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। প্রাচীন কবিরা নারীর নেত্র-বিলাস অঙ্গহীন দেবতার রণকৌশল বলিয়া যে কবিতা লিখিতেন, নলিনীরঞ্জন বুঝি তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন।

মৃণালিনীর বিলম্ব সহিল না, সেই আগে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিল, "আপনি বোধ হয় ধাঁধায় পড়েছেন! যিনি আপনার পাঁচ হাজার টাকা মূল্য কসেছেন, সে আমি নই, ইনি,—আমার প্রিয় সখী।" মৃণালিনীর স্পষ্ট কণ্ঠ, স্পষ্ট ভাষা, কিন্তু কথনভঙ্গিমা একটু কর্কশ। নলিনীরঞ্জন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। বুদ্ধিমান্ বিদ্বান্ যুবক সপ্রতিভের মতনই বলিলেন, "সে আগেই বুঝ্‌তে পেরেছি! তবে আপনার প্রিয়সখীর একটু মুখ-সুধা পানের জন্য আমার কর্ণ বড়ই উৎসুক।"

"বাক্য-সুধা কর্ণে পান করিতে পারে বটে, কিন্তু মুখ-সুধা অর্থাৎ থুথু কোথাও পড়্‌লে মাছি মশায় খুটে খায় জানি।" বলিয়া মৃণালিনী হাসিল, শৈলও হাসিল, শৈল হাসিল বড় বেশী। শব্দ মুখ ফুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল। মৃণালিনী তাহাকে চিমটি কাটিয়া বলিল, "আমার সখীটি একটু হাঁদা গোছের আছেন। তা অবশ্যি এত বিদ্বান্ ব্যক্তি আপনি—বুঝ্‌তে পাচ্ছেন। তবে ওটা ভাল বই মন্দ নয়। অমন লোক নিয়ে ঘরকন্না করা বড় সুখের। এলবাক পোষাক সোণারূপা পুঁজিপাটার

দিকে নজর যাবে না, দুটো মিষ্টি কথা পেলেই হলো। এখন শ্রী চেহারা—অবশ্য নেহাৎ মন্দ নয়। চোক্ দুটি একটু বেশী লম্বা, আর একটু খাটো হলে ভাল হতো। তা অত মনমত কোথাইবা মিলে? চেহারাটা একটু বেটে, আমার মতন একটু লম্বা হলে ভাল হতো। গায়ের রংটা ত ফরসা, তা অতটা ফর্‌সা না হ'লেও চল্‌তো, বাঙ্গালীর মেয়ে আমার মতন শ্যামবর্ণা হলেই যেন মানায় ভাল। লিখ্‌তে পড়্‌তে খুব ভাল, খুব নভেল পড়্‌তে আর কবিতা লিখ্‌তে জানেন। এঁকে নিয়ে আপনি খুব সুখী হবেন। দোষে গুণে মানিয়ে যাবে, ওঁর বাবার অনেক টাকা! আপনি যে একখানা দু'চাকার গাড়ী ফাউ চেয়েছেন, তাতে না হয় আমরা রাজীই হবো।

শৈল কিন্তু আর সহিয়া থাকিতে পারিতেছে না। চৌদ্দ বৎসরের মেয়ে এত বড় ব্যাপারে কতক্ষণ না হাসিয়া থাকিতে পারে? মুখে সুধা ক্ষরিয়া, (বাস্তবিক শৈল বড় সুকণ্ঠ) শৈল বলিল, "রাখ্ ভাই তোর বক্তৃতা, ভদ্রলোককে একটা কথা বল্‌তে দে।"

"তা বলুন না, আমি কি তোর ভদ্রলোকের মুখ আট্‌কিয়ে রেখেছি।"

"তোর কথার উপর ফুরসুত পেলে ত?"

"না, আমি আর কথা বল্‌বো না। দেখুন মশাই, সোণারূপা হলে কষ্টি পাথরে ক'সে নিতে পার্তেন। রত্ন কস্‌বারত পাথর নাই। ঝুঁটা বা খাঁটি রত্নের পশারীই বোঝে। তা আপনি যদি মণিরত্নের এতই সমঝদার হন, আর এ মণি যদি ঝুঁটা বলেই বোধ হয়, তবে আমরা আরও কিছু সোণারূপা দিয়ে ক্ষতিপূরণ কর্‌তে রাজি আছি। মোদ্দা অপছন্দে পায়ে ঠেল্‌বেন না।"

"তুই দেখ্‌ছি লোকটাকে পাগল করে দিলি।" ব'লে শৈল মিণার মুখে একটা চড় মারিল।

তথাপি মিণী থামিল না, বলিল, "দেখ্ তোর বয়স চৌদ্দ, আর আমার ষোল। এ দু'জনের চা'র চোকের সুমুখে দাঁড়িয়ে যে পুরুষ পাগল না হয়, তাকে আমি পুরুষ বলি না, কাঠ পাথর বল্‌তে পারি। কি বলেন মশাই আপনি ?"

নলিনীরঞ্জন এখনও যুটাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না, কি বলিলেন। কেবল উভয়ের প্রতিই তীব্র দৃষ্টিপাত করিতেছেন, তবে জ্যেষ্ঠা তাঁর দৃষ্টিটা কিছু বেশী আকর্ষণ করিয়া লইতেছে। মিণী আবার কথা আরম্ভ করিল, "আমার মুখের দিকে ওনি ঘন ঘন তাকাচ্ছেন, তা তাকালে কি হবে ? রূপ গুণ তাকালে কি হয় ? বাবার ঘরে বর কেনার কড়ি নাই। নইলে এই ষোল বছরেও আইবুড় থাকি ? না, আপনার কাছে আর মিথ্যা বল্‌বো কেন ? আমার বয়স এই সতের পার হয়ে আঠারতে দাঁড়িয়েছে ! কেবল কড়ির অভাব।"

এবার নলিনীরঞ্জন একরূপ কথা জোটাইলেন, বলিলেন, "কড়ির কি প্রয়োজন ? কত বর বিনিমূল্যে এসে পায়ে লুটাবে।"

"তাওত ভাল লাগে না, কড়ি দিয়ে না কিন্‌লে কি জিনিষের কদর হয় ?"

"কদর বাড়ে আদরে। কড়িতে কি করে ?" কথার মতন জবাব দিতে পারিয়াছেন ভাবিয়া এবার বাবু খুব খানিকটা হাসিলেন। মিণী বলিল, "বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না ? এই ত আমার প্রিয় সখী হাজার পাঁচেক টাকা দিয়ে পাঁচটা পাশ করা বরের গলে দড়ি দিলেন। এর পর যখন যেমন খুসি তেমনি ভাবে তাকে ব্যবহার কর্ত্তে পার্‌বেন। ধমকটা, ধামকটা, চোক্ রাঙ্গানিটা, নাক ফুলানিটা, চাই কি দরকার হ'লে দু' একটা গলা ধাক্কার সদ্ব্যবহার কর্ত্তে সমীহ কর্‌বেন না। টাকার

মাল, খাতির কি ? টাকায় ঘোড়ার দরদ আছে বটে, তবে পাল্লায় উঠ্‌লে, চাবুক চাপা চলে না।”

এতক্ষণে নলিনীরঞ্জন বুঝিলেন, বালিকার কথার মর্ম্ম। একটা অচেনা বালিকার এত মুখরাপনা পুরুষ কতক্ষণই বা সহ্য কর্ত্তে পারে ? তাঁহার দৃষ্টি গরম হইল, উত্তপ্ত স্বরে বলিলেন, “নেহাৎ অসহনীয় মুখরা মেয়ে দেখ্‌ছি, তুমি ! নিরস্ত হও। এঁর কাছে দুটো কথা ব’লে আমি চ’লে যাচ্ছি।”

“বেয়াদবি মাপ করুন, এখন আপনার ওর সঙ্গেই আপনি কথা বলুন।” বলিয়া মিণী একটু সরিয়া বক্র কটাক্ষে তার দিক দৃষ্টিপাত করিয়া বসিয়া রহিল। শৈল এখন তাহার ভূমিকার অভিনয় করিতে অগ্রসর হইল। কিন্তু মিণীর মতন তেমন স্পষ্ট ভাষায়, অবাধ কণ্ঠে সে কথা বলিতে পারিল না। ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাধ বাধ স্বরে সে বলিল, “আপনাকে আমরা খুব ধাঁধায়ই ফেলেছি। আপনি যার পাঁচ হাজারের সামগ্রী সে আমি নই, উনিই। আমি আপনার যোগ্য নই, আপনিও আমার যোগ্য নন। আমি টাকা দিয়ে স্বামী কিন্‌ব না। স্বামী আসবেন··রূপের চটকে, প্রেমের ফটকে বাঁধা পড়বেন। হৃদয়ের পূজায় যদি দেবতা খুসী না হন, তবে পাঁটা মোষ বলি দিয়ে দেবতাকে রাক্ষস কর্ত্তে প্রবৃত্তি হয় না।”

সর্ব্বনাশ ! এ কোন্ প্রহেলিকা ? নলিনীরঞ্জনের মস্তিষ্কের বল ছিল, নইলে মাথা ঘোরার সম্ভাবনা ছিল। তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। উভয়েই বলিল, “কোথা যাচ্ছেন ?”

নিতান্ত অপরাধীর মতন নলিনীরঞ্জন মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, “আমি আর বিলম্ব কর্‌তে পারি না।”

মিণী বলিল, “কি বুঝে গেলেন ?”

"আমি কোনও উত্তর দিতে বাধ্য নই।" বলিয়া বাবু দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। মিণী তখনই দ্বারে পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বাধ্য নন্ একথা বল্‌তে পারেন কই? যখন আপনি নিঃসহায়, আমাদের ঘরে বন্দী! ভয়ে চেঁচিয়ে উঠে পুরুষ জাতির অপমান কর্‌বেন না। দুটী কথার উত্তর দিয়ে যেতে হবে আপনাকে। প্রথম, যদি কেউ টাকা দিয়ে আপনাকে কন্যাদান না করেন, তবে আপনি কি যোগ্য মূল্য হলো না বলে অবিক্রী থাকবেন? না শেষে কারু আঁচল ধরে পুরুষ জন্মটা সার্থক কর্‌বেন? দোহাই আপনার সত্যধর্ম্মের, মিথ্যা বল্‌বেন না।"

"বর পণ যদি উঠে যায়, তবে কি পুরুষ চিরকাল আইবুড় থাকবে?" বলিয়া যুবক এবার একটী প্রশ্নের প্রতীক্ষায় প্রশ্নকর্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার ললাট ও নাসাগ্র ঘর্ম্মাক্ত হইতেছিল। মৃণালিনী বলিল, "তখন অবশ্য পাত্রীটা মনমত চাই।"

"হ্যাঁ! তা চাই বই কি?"

"আচ্ছা! আমাদের এ দুটীর ভিতর কোনটী আপনার মনমত?"

"দুটী প্রশ্নের উত্তর দেবো, তিনটীর ত কথা নাই।"

"আপনার চরণে ধরে ক্ষমা চাচ্ছি, দয়া করে এই কথাটীর উত্তর দিন।—আমাদের মধ্যে কে আপনার মনমত?"

"কেউ নয়।"

"বেশ! আপনি কিন্তু আমাদের উভয়েরই মনমত! এখন আসুন, নমস্কার।" বলিয়া মৃণালিনী দ্বার খুলিয়া দিল। নলিনী বাবু ছুটিয়া একবারে রাস্তায় গিয়া পড়িলেন, সঙ্গের যে বাবুটী ছিলেন, তাঁকে ডাকিয়া লইতেও ভুলিয়া গেলেন। সকলে শশব্যস্ত, ছুটিয়া গিয়া তাহার পথ আটক করিল। আহত ব্যাঘ্রের ন্যায় নলিনী বাবু কোনও রূপ

শিষ্টাচারের বাধা না মানিয়া দ্রুতপদে অন্তর্হিত হইলেন। সকলে অবাক হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

---

(৪)

ভিতরের কথা অচিরাৎ ব্যক্ত হইল। যাহারা আড়ি পাতিয়া শুনিয়াছিল, তাহারা প্রকাশ করিল। শৈলকে চাপিয়া ধরিলে সেও সকল কথা প্রকাশ করিয়া দিল। এ অসম্ভব অসঙ্গত ব্যাপারে সকলেই বিরক্ত ও মর্ম্মাহত হইল। বিনয় বাবু আর্ত্তনাদে কহিলেন, "নবম বর্ষে কন্যাদান ব্যবস্থা শাস্ত্র বিধি, তা অমান্য করে, আমরা যাই মেয়ে ধাড়ী করে লেখা পড়া শিখিয়ে পণ্ডিত কর্ত্তে! এই তার প্রতিফল।" ঝড়ে ভাঙ্গা বাগানের মতন সে উৎসবময় বাড়ীটা নিরানন্দে নিঝুম্ হইয়া পড়িল।

মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে বিনয় বাবু তাঁহার বাল্য-বন্ধু বড় অন্তরঙ্গ বলাই দাদাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন। এই বলাই দাদার চরিত্র বড় মধুর, প্রীতিপ্রদ, তাঁহার জীবন কাহিনীতেও কিছু বিশেষত্ব আছে। বলাই দাদা বা বলদেব পণ্ডিত পল্লীগ্রামে নারিকেল সুপারি আম কাঁটালের গাছের ছায়ায় এক দরিদ্রের ঘরে জন্মিয়া ছিলেন। অতি শৈশবে তার পিতৃবিয়োগ ঘটে; কিছু জোত জমি ছিল, তাহার সাহায্যে অনাথা জননী অত্যধিক আদরেই বলদেবের প্রতিপালন করেন। বলদেব অতি দুর্ব্বৃত্ত হলেও, প্রখর মেধাবী ছিলেন। পুস্তকের উপর তাঁহার মনোযোগ অল্প থাকিলেও গ্রাম্য স্কুলে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা পাশ করিয়াছিলেন। তারপর তার ইচ্ছা হইল, কলিকাতার কলেজে পড়ে

খুব বড় হইতে। মাতার সেরূপ ইচ্ছা নয়, কলিকাতায় রাখিয়া ছেলে পড়ানর মতন শক্তিও তাঁর ছিল না। তখনকার কালে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা পাশ করিতে পারিলে নেহাৎ অকর্ম্মা বাজে লোকের মতন থাকিতে হইত না। আদালতের আমলাগিরি বা রেলের অফিসারি একটা কিছু জুটাইয়া সে সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতে পারিত। বলদেব তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। মাকে কাঁদাইয়া কলিকাতায় পড়িতে গেলেন। দুবেলা দু'টো ছাত্র পড়াইয়া মাসিক কুড়ি টাকা রোজগারের ব্যবস্থা করিলেন। তখন ১৫৷২০ টাকায় কলিকাতায় বাস চলিত। সেই পঠদ্দশায় বিনয় বাবুর সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল, আজ এই চল্লিশ বৎসরের শেষেও বলদেবকে কেহ ভুলিতে পারেন নাই। বলদেব স্বভাব সুকণ্ঠ গায়ক, সুবক্তা, সদানন্দ, নিরভিমান, সকলের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন! তাঁহার বিশেষত্ব, চিরদিন তাঁহার হালকা ভাব, গাম্ভীর্য্য বা ভার তাঁহাতে ছিল না। হালকা হাসি, হালকা গান, আর হালকা আনন্দ নিয়েই বলদেবের দিন কাটিয়া যাইত। কিছুদিন এমনি ভাবে চলিল। একদিন বলদেব তাঁহার ছাত্রকে দুরন্তপণার জন্য এক চপটাঘাত করিলেন। ছাত্র ধনবানের আদুরে দুলাল, ছাত্রের পিতা মাতা মাষ্টারকে গালি দিয়া তাড়াইয়া দিলেন। সেদিন বলদেব তাঁহার আর টিউশনিটীও ইচ্ছা করিয়া ইস্তফা দিলেন। তারপর এক তাড়া ছড়ি কিনিয়া লইয়া চৌরঙ্গীর মোড়ে দাঁড়াইয়া প্রতি সন্ধ্যায় ফেরি করিতে লাগিলেন। এক টাকা পাঁচসিকা দৈনিক লাভ হইত। তখন কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে এমন ছোট ব্যবসায় কেহ করিত না, বলদেব কারু মানা শুনিতেন না। এ কাজটা তাঁর বড় ভালই লাগিত।

একদিন একটা ফিরিঙ্গি বলদেবের কাছথেকে এক টাকা দামে একখানি ছড়ি কিনিয়া, দাম না দিয়াই চলিয়া যাইতেছিল। বলদেব

বলিলেন "দাম দাও সাহেব, অনুগ্রহে।" সাহেব কথাও বলিল না, ছড়ি হাতে চলিতে লাগিল, বলদেব তাহার কাপড় টানিয়া ধরিলেন। সাহেব 'ড্যাম' বলিয়া বলদেবের পিঠে ছড়ির বাড়ী কসিলেন। এ সময়ে বলদেব বড় হুসিয়ার। সাহেবের ছড়ি খাইয়া, হাস্তমুখেই এক হস্তে শ্বেত মহাপুরুষের কর্ণমূল ধরিয়া আর এক হস্তে তাঁহার গালে এমন চপটাঘাত করিলেন যে, একে সাহেবের মাথায় একটু এলকোহল ধরা ছিল, বলদেবের সে শ্রীহস্ত-সমাদর তিনি দাঁড়াইয়া হজম করিতে পারিলেন না। বলদেব তাহাতেও নিরস্ত হইলেন না, চটিজুতা-পরা পায়ের একটী নাতিও সাহেবের পিঠে মারিয়াছিলেন। সাহেবের কোট ছিঁড়িয়া পিঠের চামড়া উল্টিয়া গিয়াছিল!

তখন পাহারাওয়ালা আসিয়া ধরিল। মামলা হইল। বলদেবের পঁচিশ টাকা জরিমানা বা এক সপ্তাহ সশ্রম কারাবাসের হুকুম হইল। বলদেব জেল খাটিলেন, জরিমানা দিলেন না।

সেই হইতে বলদেবের পড়াশুনায় ইতি হইল। বলদেব দেশে ফিরিয়া আসিলেন। সেই বৎসর বলদেবের মাতা এক পরমাসুন্দরী বউ আনিয়া, বলদেবকে বাঁধিয়া ফেলিলেন। বলদেবও সেই একুশ বৎসরে তের বৎসরের রাঙ্গা বউএর নাকে নোলক দোলানি দেখে, কথঞ্চিৎ স্থির হইলেন। তিনি নিজে বলিয়া থাকেন, "গুজরির ঝম্‌ঝমিতে হাতী বেহুস্ হয়ে গেল।"

তারপর গ্রামে একটী বিদ্যালয় খুলিয়া নিজে হইলেন তাহাতে পণ্ডিত। মাষ্টার বলিলে তিনি রাগ করিতেন। সেই হইতে তাঁহার নাম হইল বলদেব পণ্ডিত। ১৫।২০ টাকা তাহাতে আয় হইত। তাই দিয়া পৈতৃক বাস্তুটা খুব নারিকেল সুপারি আম কাঁটালের বাগানে সাজাইলেন। এখন তাঁর ষাট বৎসর বয়স, পণ্ডিতি ছাড়িয়াছেন, তিনটী ছেলে সমর্থ

হইয়াছে। বলাই দাদা এখন বহু ভাইয়ের বলাই দাদা হইয়া সদানন্দে নিমন্ত্রণ খাইয়া কাল কাটান। তাহাকে সকলে ভক্তি করে, কিন্তু ভয় কেউ করে না। সেই ফিরিঙ্গীর উপরে ব্যতীত বলাই দাদাকে কেহ আর কাহারও উপরে ক্রুদ্ধ হইতে দেখে নাই।

এমন অসম্ভব রকমে মৃণালিনীর বিবাহ ভঙ্গ হওয়ায় বাড়ীশুদ্ধ লোক মর্ম্মাহত হইয়া, মেয়েকে বেশী লেখা পড়া শিখান ও বেশী বয়স পর্য্যন্ত আইবুড় রাখা নিতান্ত দোযাবহ বলিয়া বাদ বিচার করিতেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় মৃণালিনী এই সব তীব্র সমালোচনা তিরস্কারে কিছুমাত্রও ক্ষুণ্ণ না হইয়া স্বচ্ছন্দ সানন্দ চিত্তে গৃহকর্ম্ম করিয়া ঘুরিতেছিল। ম্লান গম্ভীর মুখে বিনয় বাবু বসিয়াছিলেন। বলাই দাদা বলিলেন, "লক্ষ্মী মেয়ে তোমার দশ হাজার টাকা বাঁচিয়ে দিয়েছে, তবু তোমার মুখ বাদ্‌লা ভাদ্রের সন্ধ্যায় চেয়ে অন্ধকার!" ব্যথিত কণ্ঠেই বিনয় বাবু উত্তর করিলেন, "এমন গ্লানি জীবনে আর কখনও পাই নাই।"

"এত গৌরব তোমার জীবনে আর কিছুতে ঘটে নাই।"

"কি বল দাদা?"

"ব্যঙ্গ নয়, অতি সত্য কথা!"

এমন সময়ে মৃণালিনী আসিল পিতার প্রাতঃপানীয় চায়ের বাটী লইয়া, এটা তাহার নিরূপিত কার্য্য! পিতার সম্মুখে চা বিস্কুট রাখিয়া মৃণালিনী বলদেবের দিকে চাহিয়া বলিল, "চা খাবেন জ্যাঠা মশাই?"

হাসিয়া বলদেব বলিলেন, "পাগলী মায়ের আদর দেখ, ছেলেকে অখাদ্য খেতে বলে।" মৃণালিনী মুখ নত করিয়া হাসিল। বলদেব বিনয়ের পানে চাহিয়া বলিলেন, "বিনয় ভায়া! এ বয়স পর্য্যন্ত ত এজলাসে দাঁড়িয়ে লক্ষ পাপীর মুখ দেখেছ! চেয়ে দেখ, আমার মায়ের মুখের দীপ্ত হাসি! এ হাসিতে ত অপরাধের ছায়া নাই।"

মৃণালিনী চলিয়া যাইতেছিল ; বলদেব বলিলেন, "দাঁড়াও মা, বড় দুরন্তপণা করেছ।"

হাসিয়াই মৃণালিনী বলিল, "আমি বরাবরই দুরন্ত মেয়ে, দাদাদের সঙ্গে আড়ি দিয়ে দিঘী পাড়ি দিতে জিতে গিয়েছি।"

বিনয় বাবু কন্যার মুখপানে চাহিয়া মুগ্ধ হইলেন, স্নেহশান্ত স্বরেই কহিলেন, "দিঘী পাড়ি দিতে দিতে, এখন যে সাগর পাড়ি দিতে নেমে পড়েছ মা !"

"তা পড়েছি বাবা ! যদি ডুবে যাই, তবু আপনার সন্তানের সাহসিকতার খ্যাতি থেকে যাবে।" বলিয়া মিণী মুখ নত করিয়া পিতার পায়ের উপর দৃষ্টি রাখিয়া দাঁড়াইল। কন্যার গর্ব্বিত উত্তরে পিতার মন একটু কঠোর হইল, তিনি বলিলেন, "এমন কাজ কেন কর্লি ?"

সরল স্পষ্ট ভাষায় প্রখরা বালিকা উত্তর করিল, "আগে সোণা রূপার ওজন ক'সে নিয়ে, যে আপনার মেয়ের রূপ গুণের পরীক্ষা কর্ত্তে আসে, সে আপনাকে অপমান কর্ত্তেই আসে ! কন্যা সন্তান পিতা মাতার শুধু অপমান অবজ্ঞার কারণ হবে, এটা আমি স্বীকার করি না। বাবার-রক্ত-জল করা টাকায় ভাত কাপড়ের আগাম বায়না দিয়ে, পুরুষের দাসী হ'তে যাওয়া, আমি নারী জীবনের নিতান্ত হেয়ত্ব ব'লে মনে করি। আমি স্বীকার করি না, নারী সংসারের এমন আবর্জ্জনা !" বালিকার তপ্ত-কাঞ্চন শ্যাম মুখমণ্ডল যেন রক্তপ্রলেপ-মাখা হইল ! সেই স্নিগ্ধ প্রভাত সমীরেও তাহার ললাট ও নাসিকাগ্রে স্বেদ-বিন্দু ফুটিয়া উঠিল ! দীপ্ত নয়ন-কোণে অশ্রু বিন্দু ভষ্ম করিল ! তাহার যতটা বলিবার ছিল, ততটা যেন বলিতে পারিল না ! আবেগাহত প্রাণে প্রখর দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। বলদেব বলিলেন, "বুঝ্‌লাম মা তোর হৃদয়ের আবেগ ? বুকে নারীত্বের শক্তি-বহ্নি জ্বালিয়ে তুলেছ, এ পতিত

বঙ্গে এ শক্তি-রঙ্গ সইতে পার্‌বে কি ?"

মৃণালিনী কম্পিত চরণে মৃদু চলনে চলিয়া গেল ! বলদেব বলিলেন, "বুঝ্‌লে বিনয় বাবু ?"

"মেয়েটার বেয়াদবী ভেবে আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছি ।"

এমনিই অধঃপাতে গিয়েছে বাঙ্গালী বাবুর দল। একটু স্বাধীনতার উচ্ছ্বাস, একটু মনুষ্যত্বের বিকাশ একটু সত্যের আভাস দেখ্‌লেই শিহরিয়া উঠে !"

"এও কি সত্যের বিকাশ দাদা !"

"সোণারূপার আবর্জ্জনার আবরণ থেকে সীতা সাবিত্রীর জাতি নারী তার পবিত্র নারীত্বের গৌরব মাথা তুলে উঠাতে যাচ্ছে, এ সত্যের বিকাশ নয়ত কি ?"

"নারীর এ প্রগল্‌ভতার ফল শুভ ?"

"যাহা সত্য, তাই শুভ ! নরের সঙ্গিনী নারী, এটা সার সত্য। দুনিয়ায় যখন সোণারূপার কদর ছিল না, তখনও নরের সঙ্গিনী নারী। এখন যে সোণারূপায় ঢাকা পড়ে নারী এত ছোট হয়ে যাচ্ছে, নারী যদি তা বুঝে ফেলে, আর সোণারূপার চেয়ে আপনার নারীত্বকে বড় করে মানে, তাতে অশোভন লাগ্‌তে পারে,—অশুভ কি আছে ?"

"দাদা ! তোমার পণ্ডিতি বোল ছেড়ে, সোজা কথায় বলো, এব্যাপারটা কি হলো ?"

বলাই দাদা খানিকটা হাসিয়া ফেলিলেন, অনেকক্ষণ তিনি হাসেন নাই। হাসিতে না পাইলে তাঁহার স্বস্তি বোধ হয় না। তারপর বলিলেন, "দেখ, আজ কাল আষাঢ়ের গ্রীষ্মে চারি পর্দ্দা কাপড় জড়ান যেমন, বাবুদিগের এটিকেট বা আদর, তেমনি বাড়ী বাঁধা দেওয়া টাকায় জামাই বরণ করা ও একটা এটিকেট হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। বাবা মনে করেন,

মেয়েকে বড় আদরই কচ্ছি, কিন্তু আসলে মেয়েকে নেহাৎ হতমান করেই দেওয়া হচ্ছে। তা না হ'লে, জামাই এখন টাকা না হ'লে মেয়ে নিতে চান না কেন? আমি ত বলি, এই যে পণ, গণ, আভরণ প্রথা এর জন্য ষোল আনা দায়ী মেয়েওয়ালা। মৃণালিনী মেয়েটার ভিতরে শক্তি জেগে উঠেছে; সে এ অপমান সইতে চায় না।

"কে জাগালে, তার ভিতর এমন উৎকট শক্তি?"

"শক্তি কখন কি ভাবে কে জাগায়, তা বোঝা কঠিন। তবে শিক্ষার গুণে শক্তি ফোটে, মৃণালিনী সুশিক্ষা পেয়েছে। এটা তোমার গৌরব।"

"আমি মিণীকে এ পর্য্যন্ত হিন্দুভাবেই শিক্ষা দিয়েছি। তাকে সংস্কৃত শিক্ষা দিয়েছি, উপযুক্ত পণ্ডিত রেখে।"

"সেও হিন্দুর মেয়ের মতন বেড়ে উঠেছে, বিলাতী কায়দার ভারে দমে যায় নাই।"

"তুমি কি বিশ্বাস কর, এতে সমাজের কোনও কল্যাণ হ'তে পারে?"

"ততদুর ভাব্‌তে আমি যেতে চাই না। মোট কথা ব্যাপারটা নেহাৎ নূতন দেখ্‌লাম।—আর তাতে দেখ্‌লাম খাটি সত্যের ছায়া! এতে কারু কল্যাণ হ'ক না হ'ক, রঙ্গ বেশ হবে। সত্য নিয়ে রঙ্গ দেখ্‌তে আনন্দ আছে।"

"এ মেয়ের যে আর বিয়ে হয়, এমন বোধ হয় না।"

"নাই বা হোল।"

"তার পর?"

"তার পর কি? মেয়ে কদাচারিণী হবে? এমন ইতর চিন্তা করো না। এত বড় দুরন্ত পণার ফলে মৃণালিনী ব্যথা বেদনা অনেক পেতে পারে, কিন্তু ইতরত্ব তাতে কখনও সম্ভবে না। যার বুকে এত শক্তি খেলে, পাপ সেখানে প্রবেশ-পথ পায় না। মৃণালিনীর পরিণাম দেখার মতন দীর্ঘ

জীবন তুমি পাবে ব'লে বোধ হয় না। এ বয়সেই তুমি বহুমূত্রের রোগী। তোমার দাদা নিশ্চয়ই পাবে। আমি মরবার আগে দেখে যাব, মৃণালিনী অসাধারণ কিছু করেছে।"

---

(৫)

উপার্জ্জনে ক্ষতি করিয়া পল্লীগ্রামে দিন যাপন সময়ের অনর্থক অপব্যয় ভাবিয়া বিনয় বাবু সপরিবারে নগরে যাত্রা করিলেন। যাইবার সময়ে মৃণালিনী শৈলকে ডাকিয়া বলিল, "শৈল, বোনটী আমার! হয় ত আর কখনও তোর সঙ্গে দেখা হবে না। দেহ প্রাণের বিনিময়ে পুরুষ নারীর দাসীত্ব গ্রহণ কর্ত্তে চায় না, রজত-কাঞ্চন দক্ষিণার আবশ্যক, নারীর এ অপমান বড় অসহনীয়! এ কথাটী মনে রাখিস্ কিন্তু!"

নলিনী রঞ্জনের বিবাহে ব্যতিক্রম ঘটিল। গৃহে ফিরিয়া গিয়া তিনি অবিকল সত্য ঘটনা প্রচার করিলেন না। বলিলেন কন্যা তাহার পছন্দ হইল না। এ বিবাহ তিনি কিছুতেই করিবেন না। তাঁহার পিতা কিন্তু ইহাতে বড় ক্ষুণ্ণ হইলেন। বহু স্থানে যাচাই করিয়াও তিনি এতটা উচ্চ দর আর কোথাও পান নাই। এখানে একটু ভিতরের কথায় অবতারণা করিতে হইল। নলিনীরঞ্জনের পিতা যৌবনের প্রারম্ভেই একটা বিলাতী মার্চেণ্ট আফিসে ৩০ টাকায় বহাল হইয়া প্রভুর মনোরঞ্জন দক্ষতায় এই পঞ্চাশ বৎসর বয়সে ১২৫ টাকায় উঠিয়াছেন এবং এই ৩০ বৎসর কাল ডেলি প্যাসেঞ্জার হইয়া সাড়ে আটটার মধ্যে স্নানাহার সারিতে সারিতে এই পঞ্চাশ বৎসর বয়সেই এক রকম জীবনের পারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। প্রথম বয়সের উপার্জ্জনে তিনি একতালা এক

খানি কোঠা ঘর করিয়াছিলেন। তার পর পুত্র কন্যা হইয়া সংসার বাড়িল, বাজার দরও চড়িল। এখন তিনটী ছেলের পড়ার খরচ ও একটী কন্যার বিবাহের খরচ যোগাইয়া তিনি বড় হয়রাণ হইয়া পড়িয়াছেন। বড় সাহেব তাঁহার জীবনের অকর্ম্মণ্যতা দেখিয়া চাকরীতে ইস্তাফা দিবার নোটিস্ দিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার ভরসা, জ্যেষ্ঠ পুত্র নলিনীরঞ্জন বি, এ পাশ করিয়াছে, ল ক্লাসের শেষ পরীক্ষা এবার হইবে। অধিকন্তু বিবাহে দর চড়িবে বলিয়া এম, এ ক্লাসেও নাম লেখাইয়া রাখিয়াছেন। পুত্রের বিবাহে এই পাঁচ হাজার টাকা হস্তগত করিতে পারিলে, তিনি একদম অন্ন বস্ত্র চালিয়ে বাকি ক'টা দিন বিশ্রাম নিতে পারেন। কন্যা দেখিতে গিয়া পুত্র এ সম্বন্ধটা ভাঙ্গিয়া দিল বুঝিয়া, তিনি বিশেষ মনঃ-পীড়িত ও বিরক্ত হইলেন।

মৃণালিনীর পিতা যে সহরে বড় পশারী উকিল, সেই সহরে একজন পেন্‌সন্ প্রাপ্ত উচ্চ পুলিশ কর্ম্মচারী রায়বাহাদুর উপাধি লইয়া বাস করিতেছেন। তাঁহারও একটী বিবাহ যোগ্যা কন্যা আছে। তিনি বিজ্ঞাপন করিয়াছেন, কন্যার বিবাহে জামতাকে হাজার টাকা খরচা দিবেন, যৌতুক দিবেন দারোগাগিরির নমিনেশন। পাত্রটী বি, এ পাশ হওয়া প্রয়োজন। নলিনী রঞ্জনের পিতা, বিনয়বাবুর কন্যার সহিত যখন পুত্রের বিবাহ হইল না, তখন এই রায় বাহাদুরের কন্যাটী লইতেই মনস্থ করিলেন। নগদে বিশেষ লাভ না হইলেও, বর্ত্তমান বাজারে একটা দারোগাগিরি চাকরী নিতান্ত তুচ্ছ করিবার বিষয় না। বহাল হইলেই মাসিক ৬০ টাকা বেখরচায় আইসে। উকিল হইয়া পশারের মুখ চেয়ে থাকার চেয়ে বরং ভাল। প্রমোশন আছে,—অন্তর্জল পর্য্যন্ত চাকরীর স্থায়িত্ব!

রায়বাহাদুর-নন্দিনী রমলার সহিত নলিনীরঞ্জনের বিবাহ পাকা

হইয়া গেল। একই পাড়ায় বাস, সুতরাং মৃণালিনীর এ সংবাদ পাইতে বিলম্ব হইল না। এবার আর পাত্র নিজে পাত্রী দেখতে আসিলেন না। শুনিয়া দুষ্টা মেয়ে মৃণালিনী যেন বড় বিজয়গর্ব্ব অনুভব করিল। পাঁচ হাজার নামিয়া হাজারে আসিয়াছে, আরও স্বয়ং পাত্রী দেখিবার বাহানা মিটিয়া গিয়াছে। মিনী এ বিজয় বার্ত্তা শৈলকে দিতে বিলম্ব করিল না। পত্র লিখিয়া সকল সমাচার জানাইল। পত্রের শেষে লিখিল, "আমার সেনা-পতিত্বে যদি তোমার মতন হাজার খানেক মেয়ে পল্টন পাই, তবে বাংলার পুরুষ দেবতারা সেধে এসে টাকা দিয়ে নারীর আঁচল-ধরা হন, তা কর্ত্তে পারি। তুই যদি একটু সবুর করে থাকতে পারিস, তবে আমি ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরে বিনিমূল্যে তোর আঁচলে বেঁধে দেবো। সাবধান! নারীর গরব খোয়াস না।"

রায়বাহাদুর গৃহিণী ছিলেন বড় দাম্ভিক, বড় মুখরা। পাড়ার কারু সঙ্গে তাঁহার ভাব ছিল না। মৃণালিনীদের সঙ্গে ত ছিলই না। এই ভাবিয়া মৃণালিনীর মনে আর একটা দুরভিসন্ধি খেলিল! যাকে এত বড় নাকালটা করিয়াছি, সেই যাবে সুমুখের রাস্তা দিয়ে বর সেজে, পাল্কি চড়ে, রোশনাই করে? সে ঢোল কাঁশি পিটুনিগুলি যে বুকে বিঁধিবে! মেয়েটার দুরন্ত পণার অন্ত নাই!

সে সহরে নারায়ণী ঘটকীর প্রসিদ্ধি প্রচলিত ছিল। নারায়ণী বিবাহের ঘটকালী যত করুক আর না করুক, পাড়ায় মেয়ে মহলে কোন্দলের ঘটকালী করিতে সে সিদ্ধিশক্তিশালিনী ছিল। তাহাতে তাহার বড় আনন্দ; মৃণালিনী নারায়ণীকে ডাকাইয়া আনিল, তাহাদের পাড়ায়ই নারায়ণীর বসতি। নারায়ণীর সঙ্গে ছলা পরামর্শ করিয়া মৃণালিনী আশা-প্রফুল্লচিত্তে কার্য্য আরম্ভ করিল।

রায়বাহাদুরের ঝি খিড়কির রাস্তা দিয়ে বাজারে যাইতেছিল, মৃণালিনী তাহাকে ডাকিল ! "ও ঝি ! তোমাদের রমলার নাকি বিয়ে !"

ঝি বলিল, "হাঁ গো, তোমার সেই বর।"

কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া মৃণালিনী হাসিয়া বলিল, "তা কি আমি জানি না ! আমরা ছেড়ে দিয়েছি, তাই ত তোরা পেলি !"

"ভাল দিদিমণি, তোমরা ছাড়্‌লে কেন ?"

"তা আর তোকে কি বল্‌বো ? রায়বাহাদুর এখন সস্তা পেয়ে ধরেছেন। সোন্দা রমলার মা এতে রাজি হলেন, এই আশ্চর্য্য ! তবে মেয়ে ভাল না, তাই যা হোক্।"

"কেন ? কোনও দোষ টোশ আছে না কি ?"

"বুঝলাম না তোমাদের রায়বাহাদুরের বাহাদুরী ! তিনি হলেন এত বড় সহরের রায়বাহাদুর ! আমাদের কাছে যাচাইতে যার কদর হলো না, তাকে তিনি কেমন করে আদর করে বাছাই কল্লেন ? রায় বাহাদুর যেন সস্তা পেয়ে মান খোয়ালেন, গিন্নী এতে রাজি হলেন কেন ? আর কিছু না হোক আমাদের ছাড়া মাল ত ? এখন আর রায়বাহাদুর গিন্নীর নত নেড়ে পাড়ার লোকের বাহানা কর্ত্তে হবে না।"

মৃণালিনী ভিতরে গেল, ঝি চলিয়া গেল। ভিতরে গিয়া মৃণালিনীর লাল মুখ খানি যেন আরও লাল হইয়া উঠিল। বালিকার চঞ্চল প্রগল্‌ভ মুখ-শ্রী সহসা যেন শঙ্কা-কাতর গম্ভীর হইয়া উঠিল। গৃহের প্রাচীরে ক্ষুদ্র কাষ্ঠমঞ্চে ক্ষুদ্র শিবমূর্ত্তিটী মৃণালিনীর সাজান পুষ্পহারে বড় সুন্দর শোভা পাইতেছিল। মৃণালিনী সকালে দুইটী ধূতরা ফুল ঠাকুরের কর্ণে পরাইয়াছিল, আর দুটী স্থল পদ্ম দিয়াছিল ঠাকুরের পদ তলে। ঠাকুর শৈলাসনে বসিয়া ডমরু বাজাইয়া, এক খানি পা ঝুলাইয়া দিয়া প্রেমার্দ্র নয়নে বিশ্বের মঙ্গল গাইতেছিলেন, ঢল ঢলু নয়নের দুই এক বিন্দু

প্রেমাশ্রু পরিহিত ব্যাঘ্রচর্ম্মে ঝরিয়া পড়িয়াছে। শিরোপরে লম্বিত ফণাধর শান্ত-তন্ময়-স্থির-নেত্রে সে সঙ্গীত শুনিতেছিল। মৃণালিনী যেবার পিতামাতার সঙ্গে কাশী গিয়াছিল, সেইবার এই মূর্ত্তিটী কিনিয়া আনিয়াছিল, এবং বড় আদরে, খেলনা না করিয়া পূজার দেবতা করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছিল। প্রত্যহ সে ঠাকুরের পায়ে সচন্দন পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করিত। আজ ঠাকুরের পানে চাহিবামাত্র তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল ; যুক্ত করে কহিল, "ঠাকুর ! এ কি প্রবৃত্তি জাগালে আমার মনে ? আমি এমন দুষ্টা হয়েছি ? তুমি কি আমায় ভালবাসিবে ? তোমার নিন্দা শুনিয়া মা আমার দেহত্যাগ করেছিলেন, তুমি মায়ের সেই প্রাণহীন দেহ শিরে ধরে ত্রিভুবন পর্য্যটন করেছিলে ! স্ত্রী পুরুষে এমন গৌরবের সম্বন্ধ যাদের দেবতার, তারা নরনারীতে এমন বেচাকিনি ব্যবসায় করে কিরূপে ? মূর্খ বালিকা আমি, আমার প্রাণে এ ভাব জাগালে কেন প্রভু।"

বালিকার গণ্ড বাহিয়া ধারা ঝরিতেছিল। মা আসিয়া দেখিলেন, মেয়ে কাঁদিতেছে। তিনি কাতর কণ্ঠে বলিলেন, "ও কি মিনী ! কাঁদ্‌ছিস্ ?" কাঁদিয়াই মিনি বলিল, "মা ! বড় পাপ করেছি।"

মা সহজে বুঝিলেন, মেয়ের অনুতাপ হইয়াছে, বলিলেন, "তা হোক, পাঁচ হাজারে দশ হাজার লাগে, ভাল বর আন্‌বোই।"

মৃণালিনী শিহরিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার প্রেমাশ্রুধারা নির্গমের পথেই স্তম্ভিত হইল, চক্ষু ঝলসিয়া উঠিল। স্পষ্ট কণ্ঠে কহিল, "কি বল্লে মা ? টাকা দিয়ে আন্‌বে বর ? টাকার ভিখারী তোমার জামাই হবার যোগ্য ? দেবতা তুষ্ট টাকায় নয়, তপস্যায়। গৌরী মা বর পেয়েছিলেন তপস্যায়, টাকায় নয়।"

মৃণালিনী দ্রুতপদে সে গৃহ ত্যাগ করিয়া গেল। গৃহান্তরে গিয়া

এক খানি পত্র লিখিলেন। "ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কারানন্তর নিবেদন,—নিতান্ত, অপ্রস্তুত অবস্থায় পাইয়া আমরা আপনাকে পরাজিত করিয়াছিলাম। সে জন্য আপনার মহত্ত্বের প্রতি কিছু মাত্র শ্রদ্ধাশূন্য হই নাই। কিন্তু আজ শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলাম, আপনার এত বড় রূপ, কুল ও বিদ্যার গৌরব অর্থহীনতায় এত বড় দমাইয়া দিয়াছে। পঞ্চাশ টাকার দারোগাগিরিতে এমন গৌরবের জীবন বিকাইয়া গেল! কাচের দরে সোণা বিকাইল? আমাদের বড় দুঃখ, এতে যে আমাদের বিজয় গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া গেল! যার কাছে জয়ী হইয়া দুর্জ্জয় বলিয়া উৎফুল্ল হইয়াছিলাম, সে এমন অপদার্থ জানিলে প্রাণে বেদনা বোধ হয় না? দাসত্বের বাজারে পুরুষ যদি এমন সস্তা বিকায়, তবে নারীজীবনে দাসীত্ব করিবার স্থান আর থাকিল কোথায়? সেই এক দিনের আলাপে যদিও আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারি নাই, তথাপি বন্ধুত্ব কেন না হইবে? অকপট বন্ধুত্বেই বলিতেছি. সবুর করুন, পাঁচ হাজারে সাত হাজার উঠিবে। হাজারে নামিবেন না। তবে বিনামূল্যে বিলাইয়া দিলে মহত্ত্ব বরং আরও বাড়িবে। আমরা এখনও দাও ছাড়ি নাই। যদি নেহাৎই আপনার কপালে এমন বেমতি হয়, তবে আপনার বাসর বন্দিশালায় বাকি কথাগুলি হইবে। ইতি। প্রণতা সেই দুইএর অন্যতরা।

মৃণালিনী তৎক্ষণাৎই পত্রের শিরোনামা লিখিয়া ডাকে পাঠাইল.

---

(৬)

পরিচারিকার মুখে উকিলের মেয়েটার অত্যধিক বেয়াদবির কথা শুনিয়া রায়বাহাদুর গিন্নী হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গেলেন। এ সহরে অর্থ ও পদগৌরবে তাঁহার তুল্য কেহ আছে এ চিন্তা তিনি কিছুতেই করিতে পারিতেন না। সে বার আর এক ব্যক্তির রায়বাহাদুর উপাধি পাইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল শুনিয়া এই নারী-শার্দ্দূলীর অন্নে অরুচি হইয়াছিল আর দশজন অলঙ্কার পরে বলিয়া, রায়বাহাদুর-গৃহিণী অলঙ্কার পরিতেন না। পড়শীর বাড়ীতে কোনও উৎসবামোদ হইলে, সে দিন তাঁহার মাথাধরা হইত। বাজারে চারি আনা দুধের সের বিকাইলে, কোনও দুধওয়ালাই রায়বাহাদুর গৃহিণীর কাছে চৌদ্দ পয়সার অধিক লইতে পারিত না; তাহাতে সে আট পয়সার জল মিশাইয়া শোধ লইত; তবু রায়বাহাদুর-বাড়ীর বাহাদুরী বজায় থাকিত। আজ এই চিরপ্রসিদ্ধ বাহাদুরীর উপর একটা বেইমান মেয়ে এমন টিট্‌কারী করিল ভাবিয়া, গৃহিণী ভাবিয়া চিন্তিয়া, রায় দিলেন, 'এ পাত্রে মেয়ে দেওয়া হইবে না। রায়বাহাদুর বলিলেন, তা কি করিয়া হয়? সম্বন্ধ পাকা হইয়া গিয়াছে। আজকার দিন বাদেই গায়ে হলুদ! পাকা দেখার ব্যাপারে বিশ টাকা খরচ হয়ে গেছে! এখন অন্য মত করিলে লোকত ধর্ম্মত বড় অন্যায় হইবে। তবে যদি বিবাহ দিতে হয়, বিনয় উকিলের বাড়ী নিমন্ত্রণ করা হইবে না। তাই বা কি করিয়া হয়? এক পাড়ায় বাস, আর দশ জনকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিনয়কে বাদ দেওয়া চলে কি করিয়া? এ ব্যাপারে সে দিন দুপুর পর্য্যন্ত কর্ত্তা গৃহিণীতে বিতর্ক

চলিল! দ্বিপ্রহরের পরে বিলক্ষণ বাকচতুরা ঘটকী নারায়ণী আসিয়া রায় বাহাদুরের সাক্ষাৎ করিল। সে বলিল যখন এত বড় দুষ্প্রাপ্য দারোগাগিরি পদ আপনার কন্যার বিবাহের যৌতুক, তখন আবার হাজার টাকা পণ কেন দিতে যাইতেছেন? যে এখন দারোগা হইতে যাইতেছে, সেত ভবিষ্যতে আপনারই মতন একজন রায়বাহাদুর হইতে পারে, এর মূল্য যে লক্ষ টাকারও অধিক। কত এম. এ. বি. এ. হাজার টাকা প্রণামী দিয়াও এ পদ লাভ করিতে পারে না। তবে আপনার টাকা আছে বলে যদি আপনি এক টাকার জিনিষ শ টাকায় কিনেন, তার আর কথা কি আছে? মোদ্দা আপনি অনুমতি করলে, আমি মাত্র ২০০৲ টাকা খরচা দিলে একজন এম, এ, পাশ বর দিতে পারি। খুব বনিয়াদী বংশ, সুন্দর রূপ, বাড়ীতে তেমন দালান কোঠা নাই, এই যা দোষ। তবে রায়বাহাদুরের জামাই দারোগা বাবু, তার বাড়ীতে দালান উঠ্‌তে আর কতক্ষণ?

হাজার টাকার যায়গায় দু'শ টাকা! রায়বাহাদুরের মন দমিয়া আসিল। সংসারে টাকার চেয়ে প্রিয় বস্তু তাঁহার আর কিছু ছিল না। তবে তিনি প্রবীন বিচক্ষণ লোক, একটা ঘটকীর কথা বিশ্বাস করিয়া সহসা কর্ত্তব্য স্থির করিবার মতন চঞ্চলতা তাঁহার ছিল না! একটু বিবেচনা করিবার সময় চাহিলেন। গৃহিণীর মনে অন্যভাব! তিনি বলিলেন, বিবেচনা আবার কি, এ সম্বন্ধ ত্যাগ করা কেন? ঘটকী বলিল, যদি বলেন, আজকার সন্ধ্যায় পাত্র আনিয়া দেখাইব। গৃহিণী তাহাতেই সায় দিয়া বলিলেন, তাই ঠিক, ছেলে দেখে পছন্দ হ'লে এই সম্বন্ধই ঠিক।

"সকালে বিকালে দু' ঘণ্টা করিয়া প্রথম শ্রেণীর ছাত্রকে ইংরাজী পড়াইতে হইবে,—মাসিক পারিশ্রমিক ১০৲ টাকা, একজন এম. এ.

অথবা বি. এ. গৃহশিক্ষক চাই। অদ্য চারিটার সময় স্বয়ং সাক্ষাৎ করিয়া আবেদন করিতে হইবে।” সহরের কয়েকটী লাইট্ পোষ্টে সকালে এই বিজ্ঞাপনটী দেখা গিয়াছিল। অপরাহ্ণে নারায়ণী ঘটকীর বাড়ীর দরজায় যুবকের দল যাতায়াত করিতে লাগিল। নারায়ণীর বাড়ী মৃণালিনীদের বাড়ীর কাছে। মৃণালিনী কাহাকেও কিছু না বলিয়া, চারিটার আগেই নারায়ণীর বাড়ীতে গিয়াছে। দুরন্ত মেয়েটা আজ কাল বড় বেপর্দ্দা হইয়া উঠিয়াছে!

এইখানে আমরা নারায়ণীর আর একটু পরিচয় দিয়া রাখিব। নারায়ণী এই সহরের একজন নিষ্ঠাবান পণ্ডিত ব্রাহ্মণের কন্যা। কুলীন কন্যা বলিয়া যোগ্য মেলের বরপাত্র না পাওয়ায় পঁচিশ বৎসর বয়সেও পিতা তাহাকে পাত্রস্থ করিতে না পারিয়াই স্বর্গগত হইয়াছিলেন। নারায়ণী পিতার ত্যক্ত ক্ষুদ্র একতালা বাড়ীটী ও সামান্য কিছু অর্থ তৈজসাদি লইয়া একাকিনী স্বাধীনভাবে বাস করিতেছেন। সেকালে তাঁহার রূপ যৌবনের প্রতি লালসা দেখাইতে গিয়া অনেক প্রবল প্রবল পুরুষই নারায়ণী দেবীর সম্মার্জ্জনীর আস্বাদ লইয়া ফিরিয়াছিলেন। এক্ষণে নারায়ণী প্রতি গৃহে যেমন কোন্দলের ঘটকী, তেমনি আবার রোগ শোকেও অকপট সাহায্য-সান্ত্বনাদায়িনী। নারায়ণীর প্রধান দোষ বা গুণ, তিনি সত্যকথা অকপটে বলিতে কাহাকেও সমীহ করিতেন না। সকলকেই ভাল বাসিতেন, ভয় কাহাকেও করিতেন না। কোনও কোনও যজ্ঞিবাড়ীর রান্না রাঁধিতে তিনি অহর্নিশ নির্জ্জলা উপবাসিনী থাকিয়া খাটিতে পারিতেন, কিন্তু জলগ্রহণ করিতেন না কোনও বাড়ীতে। নারায়ণী সধবাও নন, বিধবাও নন, চিরকুমারী; এই ষাট বছর বয়সেও সাড়ি পরিতেন, হাতে গায়ে অলঙ্কার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু আহার করিতেন একসন্ধ্যা হবিষ্যান্ন। হাস্য রঙ্গ

রসিকতা কোন্দল তিনি সকলের চেয়েই যেন অধিক ভাল বাসিতেন, নিজেই বলিতেন, সকল দিয়াছি নারায়ণে, কিন্তু এই বিষয়টী নিজের সম্বল করিয়া রাখিয়াছি। মৃণালিনী বালিকা হইলেও আজ একটী নূতনতর রঙ্গ তাহার কাছে পাইয়া নারায়ণী প্রফুল্ল চিত্তেই তাহাতে যোগ দিয়াছেন। নিজের বাহিরের ঘরখানি বেশ সাজাইয়া গোছাইয়া, কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন।

গৃহ শিক্ষকের পদপ্রার্থী কয়েকজন অমনোনীত হইয়া ফিরিয়া গেল। একজনকে নারায়ণী ও মৃণালিনী সাদরে অভ্যর্থনা করিল, ইনি এবার এম, এ পরীক্ষা দিয়া আসিয়াছেন। মৃণালিনী বলিল, "আপনি আমাদের স্বজাতি, তাই আপনাকেই আমরা পছন্দ কচ্ছি! আপনার বয়স কত মশাই ?"

"তেইশ বছর।"

"তাই ত, সরকারী চাকরী পাইবার বয়স আপনার আছে।"

"বয়স ত আছে, চাকরী কোথায় ?"

"কোথাও, কোনও চেষ্টা কচ্ছেন না ?"

"কালেক্‌টরীতে এপ্রেন্টিস্ হবার চেষ্টা কচ্ছি।"

"মুরুব্বি কেউ আছেন ?"

"সেরেস্তাদার একটু আশা দিয়াছেন।"

"আপনি কি বিবাহিত ?"

"না।"

"পুলিসে দারোগাগিরি করবেন ?"

"পেলে, করি বই কি ?"

"আপনার পিতামাতা আছেন ?"

"পিতা আছেন। মা নাই।"

"আমরা আপনাকে দারোগাগিরি লইয়ে দিতে পারি। তার সঙ্গে আপনাকে একটু ত্যাগ স্বীকার কর্ত্তে হবে ?"

"কিরূপ ?"

"মাত্র, দুশ টাকা খরচ নিয়ে একটী মেয়ে বিয়ে কর্ত্তে হবে।"

"মেয়েটী কি বড় কুৎসিতা ?"

"না পরমা সুন্দরী, সুশীলা, শিক্ষিতা মেয়ে, খুব বনীয়াদী বংশের না হলেও, এখন সম্পন্ন গৃহস্থ, সম্ভ্রান্ত ?"

"কি বলেন আপনারা ?"

"আপনি কিছু ধাঁধায় পড়েছেন। আমাদের গৃহশিক্ষকের প্রয়োজন নাই। একটী বরের প্রয়োজন, এই বরের যৌতুক দারোগাগিরি পদ। পেনসন প্রাপ্ত বড় পুলিশ সাহেব রায়বাহাদুরের কন্যা। আমরা ঘটকী, এক বর হাজার টাকা খরচায় এই কন্যা বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছেন। আমরা যদি ২০০৲ টাকায় ক'রে দিতে পারি, আমাদের ব্যবসায়ে কিছু লাভ আছে। আপনার চেহারা খানি দেখে বেশ বুঝিতে পেরেছি, রায়বাহাদুরের গিন্নী আপনাকে দেখ্‌লে ছাড়িবেন না। আপনি রাজি হন, এতে আপনার যথেষ্ট লাভ আছে। দশ পাঁচ টাকার টিউশনি কুড়িয়ে ঘুর্‌তে হবে না। দারোগাগিরি হ'লেই মাসে ৭৫৲ টাকা। পুলিশ সাহেব রায়বাহাদুরের জামাই দারোগা, আরও আপনি স্বয়ং এম, এ, প্রমোশন্ শীঘ্রই হবে। দুই একটী চুরি ডাকাতি স্বদেশী বলে রিপোর্ট্ করলেই প্রমোশন। কি বলেন, অমত করবার কোনও কারণ নাই।"

"হাজার টাকার স্থলে দুশ টাকায় আমি কেন স্বীকার কর্‌বো ?"

"না করেন, আপনারই ক্ষতি। আপনি যখন দশ টাকার টিউশনির জন্য লালায়িত, তখন বেশ বোঝা যাচ্ছে, আপনার তেমন কোনও

মুরব্বি নাই, কাজেই এত বড় একটা সরকারী চাকরী আপনার কিছুতে জুটতে পারে না। আপনাকে সারাজীবন এমনি ছেলে পড়িয়ে গুরুগিরি করে কাটাতে হবে। দেখুন শবুরে মেওয়া ফলে। আগে টাকা দেখে ভুলবেন না। রায়বাহাদুরের অনেক টাকা, তার দুটো ছেলে হস্তিমূর্খ। একটা পরীক্ষায়ও পাশ কর্ত্তে পারে নাই। আপনি হবেন তার প্রিয় জামাতা। টাকার অভাব আপনার জীবনে হবে না।"

"যিনি হাজার টাকা দিয়ে মেয়ের বিয়ে দিতে যাচ্ছেন, তিনি এক কথায় আমায় কন্যা দিতে সম্মত হবেন কেন?"

"সে ভার আমাদের। আপনি রাজি হ'য়ে এখনই কন্যা দেখতে চলুন।"

"আমার পিতা আছেন।"

"সম্বন্ধ স্থির করে তাঁকে পত্র লিখুন। তিনি এসে শুভ কার্য্য সম্পাদন কর্‌বেন। তিনি নিশ্চয়ই খুব ধনবান ব্যক্তি নন্, আপনার দারোগাগিরি পদে তুষ্ট বই রুষ্ট হবেন না।"

অতঃপর নারায়ণী বরপাত্র লইয়া সন্ধ্যার পরেই রায়বাহাদুরের গৃহে উপস্থিত হইলেন। গৃহিণী দেখিয়া বলিলেন, ভাল ছেলেই ত,—একেই মেয়ে দেব। কর্ত্তা বিবেচনা করিবার জন্য পর দিনের প্রভাত পর্য্যন্ত সময় নিলেন।

এদিকে মৃণালিনীর পত্র পাইয়া নলিনীরঞ্জন মহা তুফানে পড়িয়া গেলেন। আর কিছু না হোক, সেখানে বিবাহ করিতে গেলে, সেই দুটী মেয়ে যদি বাসরে বিরক্ত করিতে আসে, তবে সে অসহনীয় হইবে! ওদের সংস্রব যেখানে আছে, সেখানে যাওয়াই হইবে না। নলিনী পিতাকে গোপন করিয়া এক টেলিগ্রাফ্ পাঠাইলেন, "আপনার কন্যা বিবাহ করিতে রাজি নই। আপনি অন্য চেষ্টা করুন।"

টেলিগ্রাম সকালে আটটার পর রায়বাহাদুরের কাছে পৌঁছিল! রায়বাহাদুর একরূপ হাপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। গৃহিণীর মাথা ঠাণ্ডা হইল। নারায়ণী ঘটকীকে ডাকিয়া নূতন সম্বন্ধ স্থির করা হইল।

মৃণালিনী রমলার বাসর জাগিতে গেল না। নারায়ণীকে সে কার্য্যে পাঠাইয়া দিয়া, শৈলকে পত্র লিখিল। "পাঁচ হাজারের স্থলে দুই শতে নামাইয়াছি।—সত্যের জয়! সাবধান শৈল! এবার পূজার সময়ে সাক্ষাৎ হইবে।"

---

(৭)

দুই দুইবার বি, এ, পাশ ছেলে নলিনীরঞ্জনের বিয়েটা ভাঙ্গিয়া গেল! নলিনীরঞ্জনের পিতা যেমন মর্ম্মাহত তেমনি ক্রুদ্ধ হইলেন। বি. এ. পাশ বরের পিতার এমন লাঞ্ছনা ত নেহাৎ অসম্ভব! তিনি কন্যা কর্ত্তার বাড়ীতে স্বয়ংই গিয়া উপস্থিত হইলেন। যত বড় ক্রোধে গিয়াছিলেন, তত বড়ই আঘাত পাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। কন্যা কর্ত্তা স্বয়ং বরের টেলিগ্রাফ্‌টা দেখাইয়া বর কর্ত্তাকে বেকুব বনাইয়া ফিরাইয়া দিলেন। তখন রাগ হইল তাহার ছেলের উপর! এই ছেলেকে তিনি না খেয়ে না পরে কলেজে পড়িয়ে মানুষ করেছেন। টেলিগ্রামটা সাথে লইয়াই তিনি বাড়ী উঠিলেন। ছেলেকে ডাকিয়া টেলিগ্রাফের কাগজটা ছুড়িয়া তার গায় ফেলিয়া গর্জ্জিয়া বলিলেন, "দেখ্ দেখি এটা কি? হতভাগা পাজি?"

নলিনী নীরবে কাগজ খানা কুড়াইয়া লইয়া পড়িয়া দেখিয়া নীরবেই উঠিয়া গেল। এ সত্য বিষয়টা নিয়ে ক্রুদ্ধ পিতার সঙ্গে বিতণ্ডা করার

ধৃষ্টতা পরিহার করিয়া শান্তছেলের মতন নলিনীরঞ্জন অন্তরালে গিয়াই লজ্জা নিবারণ করিল। কিন্তু পিতার ক্রোধ প্রশমিত হইল না। তার বড় আশায় দাগা পড়িয়াছে। ষাট বছর বয়সের পারে দাঁড়িয়ে, এত বড় সংসারের ভারটা বহন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভবই হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আফিসের বড় সাহেব মৌখিক নোটিস দিয়াছেন, এ বয়সে তাঁহার দ্বারা আর কাজ চলে না। তাঁহার বড় ভরসা, ছেলে কৃতবিদ্য বয়স্ক হইয়াছে। তিনি কোনও পরীক্ষায় পাশ না পাইয়াও এতকাল সংসার ধর্ম্ম একরূপ চালাইয়াছেন, আর ছেলে পাঁচটা পাশের কাছাকাছি গিয়াও একটা পয়সা রোজগার করিবার ক্ষমতা লাভ করে নাই। অধিকন্তু ধৃষ্টতা করিয়া দুই দুই বার তার ধন মানের ক্ষতি করিয়া তাঁহাকে এমন অপ্রস্তুত করিল। তাঁর বাবা গিরিতে বেজায় আঘাত লাগিয়াছিল, দু'দশ দিনে সে ক্রোধ দমিল না, সে ক্ষত সারিল না। গালি তিরস্কারের অবিরাম পশরা ছড়াইয়া তিনি তাহার সংসারটাকে তিক্ত করিয়া দিলেন। যখন নেহাৎ অসহ্য হইল, তখন নলিনীরঞ্জন বাড়ী ছাড়িয়া আর কখনও ফিরিবে না সঙ্কল্পেই বাহির হইয়া গেলেন! তাঁহার যে কাহার উপর ক্রোধ হইল, তাহা তিনি নিজেই বুঝিতে পারিলেন না। মৃণালিনীর নির্লজ্জ প্রগল্‌ভ মুখখানা দুই একবার মনে পড়িল!

প্রখরা পাপিষ্ঠা মৃণালিনীর এ সংবাদ পাইবার কোনও সুযোগ ছিল না। শুনিলে বোধ হয়, তাহার জয়োল্লাস বাড়িয়া যাইত। এমনি করিয়া, সবে এই সতের-বছর বয়সে সে যে এত বড় একটা সংসারের ভরসা ও শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিতে পারিয়াছে, তাহা শুনিলে তাহার আনন্দই হইত। এক রকম সর্প আছে, তাহারা দংশন করিয়া দূরে দাঁড়াইয়া থাকে, চিতার ধোঁয়া কখন ওঠে তাই দেখিবার জন্য।

সেবার পূজায় শৈলের সঙ্গে দেখা করিবার সুযোগ মৃণালিনীর

হইল না। তাহার পিতার স্বাস্থ্য নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। তিনিও বৃদ্ধ, তিনিও সংসার ভারে ক্লান্ত! তাঁহার দুইটী পুত্র মানুষ হইয়াছে, একটী বিলাত গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছে, আর একটী জজ আদালতের উকিল। কিন্তু ছেলেদের দ্বারা তাঁহার সংসার ভার বহনে বিশেষ সাহায্য হয় না। এ দিকে বড় আদরের কন্যা মৃণালিনী তাহাকে বড়ই ব্যথিত করিয়া দিয়াছে। তাই জীর্ণদেহ আরও জীর্ণ হইয়া পড়িল। তিনি বায়ু পরিবর্ত্তনে সেবার গেলেন এলাহাবাদে। বাড়ী যাওয়া হইল না, মৃণালিনীও পিতামাতার সঙ্গে গেল।

পল্লীবাসিনী বালিকা শৈল মৃণালিনীর সাবধান শাসন মানিতে পারিল না। মৃণালিনী কাছে থাকিলে তাহার সাহস হইলেও হইতে পারিত, কিন্তু এত কালের অসংশ্রবে শৈল যেন সব ভুলিয়াই গিয়াছিল। শৈলর দরিদ্র পিতা শৈলর জন্য বর খুজিয়া আনিলেন। বরটী দ্বিতীয় পক্ষ, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, অভগ্ন স্বাস্থ্য, বিশেষ ধনবান্; কলিকাতায় দালালি করিয়া বাড়ী গাড়ি করিয়াছেন। তিনি শৈলর গা ভরা সোণা দিলেন। শৈলর বাপের বিশেষ কিছু লাগিল না, পরন্তু এত বড় লোক জামাই পাইয়া ভবিষ্যতের একটা ভরসা স্থলের সংস্থান হইল ভাবিয়া বিশেষ আশ্বস্তই হইলেন। শৈলবালা বাবার আশীর্ব্বাদ মাথায় করিয়া লইয়া, অলঙ্কার পরিচ্ছদে সাজিয়া স্বামীর ঘরে গেল! মৃণালিনী সময় মত সংবাদ পাইল না! শুভ-কর্ম্ম অতি সত্বরই হইয়াছে, শৈল মৃণালিনীকে জানাইবার সময়ও পায় নাই। জানাইতে বাধাও ছিল। সে দিন সেই মৃণালিনীর বর ফিরিয়া যাইবার দিন হইতে পাড়ার লোকে, মৃণালিনীর যা নিন্দা অপবাদ করিয়াছিল, তাতে শৈলর নামটাও জুড়িয়া দিয়াছিল। এবং মৃণালিনী কলিকাতার বড় মানুষের মেয়ে, মেম সাহেব, তার বিয়ে না হয়, মিশনারীর দলে মিশিবে, গরীবের মেয়ে শৈলর কি

উপায় হইবে, ভাবিয়া অনেকেরই একটু আধটুকু মাথাব্যথা ধরিয়াছিল। সেই থেকে শৈল যাহাতে মৃণালিনীর সঙ্গে মিশতে না পায়, বা তাহার কাছে চিঠি পত্র আদান প্রদান না করে, তাহার জন্য গ্রামবাসীর বিশেষ অনুরোধে তাহার পিতামাতা বিশেষ সাবধান ছিলেন।

---

(৮)

নলিনীরঞ্জন পিতার অবিরাম তীব্র তিরস্কারে ব্যথিত হইয়া, পিতা মাতা পরিজনের সঙ্গে চিরতরে সম্বন্ধ ছিন্ন করিবার সঙ্কল্প করিয়াই বাড়ী ছাড়িলেন। বাড়ী ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিলেন। তাহাই সকলে আসে। যাহার বিস্তর আছে, সে আসে তাহা বিস্তৃত ভাবে ভোগ করিতে,—রাজধানীর সৌষ্টব সমুদ্রে। যাহার কিছু নাই, সে আসে তাহার রিক্ত হস্ত পূর্ণ করিতে,—কুড়াইয়া গোছাইয়া সহরের ঐশ্বর্য্যের ভিতর হইতে। যাহার ছিল, হারাইয়া ফেলিয়া ব্যথিত বিড়ম্বিত হইয়াছে, সে আসে আপনার অক্ষমতা দুর্ভাগ্য লুকাইয়া রাখিতে—নগরের ধনজন কোলাহলের অন্তরালে। নলিনীঞ্জরনও এমনি একটা ভাব নিয়া কলিকাতায় একটা প্রবাসী আশ্রমে আসিয়া আশ্রয় লইলেন।

পিতার উপর তাহার যে অসম্বরণীয় বীতরাগ, এবং তাহার উপর পিতার যে নিষ্ঠুর অসহিষ্ণু ক্রোধ, তাহার মূলেই একটা প্রগলভা কিশোরী। ইহা সে দুদিন ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিকই বুঝিয়া লইল। সেই অতি উষ্ণ উদ্ধত যন্ত্রণা-দগ্ধ মনেই নলিনীরঞ্জন বিস্মৃত-প্রায় মৃণালিনীর স্মৃতিটা ডাকিয়া গোছাইয়া আনিল। কি প্রগলভ দম্ভে জ্বলেছিল তার মুখ খানা! অথচ চ'কে ফুটেছিল, সলজ্জ সহানুভূতি! অধরে হাসি ফুটেছিল, কিন্তু

তার উপরে ছিল একটা তীব্র ব্যঙ্গের আবরণ ! নইলে, সে অধর যদি প্রীতি-বশে স্ফুরিত হইত, তবে কি মনোমোহন মধুরই হইত ! মৃণালিনী দুষ্টা, অতি প্রখরা, অতি চতুরা ! কিন্তু কি তেজস্বিনী !—কি দর্পদীপ্ত উজ্জ্বল কান্তি ! কিসে এত অহঙ্কার সামান্য এ নারীর ! সামান্য বালিকা সে, আমার এত আশার জীবনটা মাটী করিয়া দিল !

এ বিষয়টা বেশী ভাবিবার নলিনীরঞ্জনের সময় ছিল না। সে রিক্ত হস্তে রাজধানীর রাস্তায় ঘুরিতেছে, নিতান্ত বেকার ! নির্দ্দয় পিতামাতা তাহাকে দু'টী মাসও অবসর দিলেন না, একটা উপার্জ্জনের পথ খুঁজিয়া লইতে। যাঁহারা এত কাল তাহাকে পালন করিয়াছেন, বিদ্যা শিখাইয়াছেন, শুধু বিনিময়ের লোভে, লাভের আশায় ! তাহাতে কি এতটুকু স্নেহের টান নাই ! পিতা টাকার বিনিময়ে বিকাতে যাইতেছিলেন পুত্রের পুরুষ-দর্প, তাই ত সামান্য বালিকা আমাকে এত অপমান করিল ! নলিনীরঞ্জন সারাদিন উমেদারী করিয়া এক পয়সার মুড়িও জলপানি করিতে পাইল না, তখন নাড়ী-জ্বালা ক্ষুধায় তাহাকে অবশ অবসন্ন করিয়া দিতেছিল ! তাহার পিতাও এই কলিকাতায় চাকরী করিতেন, নলিনী পিতার সঙ্গে দেখা করিল না, পিতাও পুত্রের অনুসন্ধান লইলেন না।

নলিনী ৩০৲ টাকা বেতনে একটা চাকরী পাইল। তাহার অন্নের সংস্থান হইল ! এর চেয়ে বড় আশা তাহার আর ছিল না। সে মনে মনে প্রবোধ লইল, যদি পারিতাম, টাকা দিয়া পিতার আশা পূর্ণ করিতাম, যখন পারি না, তখন আর কি করিব ? মায়ের কাছে পত্র লিখিয়া জানাইল, আমি ভাল আছি। এই পর্য্যন্ত।

নলিনীর পিতার চাকরী ছাড়িতে হইল। অত বৃদ্ধ অসমর্থ শরীরে, মুনিবের কাজের ক্ষতি হইতে লাগিল, তিনি অগত্যা বড় কাকুতি মিনতি করিয়া, বড় সাহেবকে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, তাঁহার মেঝ ছেলের জন্য

একটী ৫০৲ টাকার কেরাণীগিরি পুরস্কার লইয়া চাকরীতে অবসর লইলেন ! নলিনী সে সংবাদ পাইল ! হায় ! নিষ্ঠুর পিতা ! এ সময়েও কি তোমার এ বিনাদোষে লাঞ্ছিত পুত্রকে স্মরণ করা উচিত ছিল না। নলিনী সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল ? ত্রিশ টাকার কেরাণীগিরি ও মেসে বাসই সে জীবনের সার করিয়া লইল !

এ বয়সে জীবনটাকে একটানা একই ভাবে দাঁড় করিয়া রাখা পুরুষ প্রকৃতির আয়ত্ত নহে ! উদ্দাম কর্ম্মেন্দ্রিয় স্থির থাকিতে চায় না ! নলিনীও একটা খেলা আরম্ভ করিল। মেসের ঝিকে ডাকিয়া বলিল "তুমি ঘটকী হয়ে আমার বিয়েটা জোটিয়ে দিতে পার ?" ঝি সানন্দে রাজি হইল ! সম্বন্ধ আসিল অনেক স্থানে। নলিনীরঞ্জন ক'নে পছন্দ করিতে গিয়া খুব মণ্ডামিঠাই খাইল। আর সেই মেয়েগুলির সামনেই স্বচ্ছন্দে দৃপ্তস্বরে বলিয়া আসিল, "না এ মেয়ে আমার পছন্দ হইল না। এটাই বুঝি সে সেই দাম্ভিকা মৃণালিনীর বেয়াদবির কতকটা প্রতিশোধ ভাবিয়া লইল।

এতেও নলিনীর অন্তরের জ্বালা জুড়াইতেছে না বা খেয়াল মিটিতেছে—না। তেইশ বছরের যুবক, উদ্দাম মনোবৃত্তি, আশা ভরসা ছিল অনেক, সহসা কি ছাই একটা নগণ্য বালিকার ছলনায় পড়িয়া জীবনটাকে সে কি করিয়া তুলিল ? সেই যে একখানা চিঠি পাইয়া শেষ বিবাহটা ভাঙ্গিয়া দিয়া পিতার বিরাগ ভাজন হইল ; সে চিঠিতে এমন কি ছিল ? সে শুধু ব্যঙ্গ ? না আর কিছু ? চিঠিখানা ত তখনই ছিড়িয়া ফেলিয়াছি ! কিন্তু যতদূর মনে হয় তাহাতে ছিল কেবল বিষাক্ত বিদ্রূপবাণ, কিন্তু নির্লজ্জ মেয়েটার। এত গরজ কেন আমাকে এমনভাবে নাকাল কর্ত্তে ! যতদূর মনে হয়, সেই পত্রের উপর যেন তার রঙ্গ-মাখা হাসিমুখের ছাপটা পড়েছিল ! এইত এতগুলি পাত্রী দেখিলাম, লজ্জায় জড়সড়,

থতমত খাওয়া বিকৃত মুখে কেউবা মৃদু হাসি হাসিল, কারু চ'কে পলক পড়িল, কেউবা পলক ফেলিতেও পারিল না! তেমন সহজ সহজ সরল ভাবে হাসিতে, কথা বলিতে কেহই পারিল না, সবাই এসেছিল, সেজে গুজে, রং মেখে, গন্ধ উড়িয়ে, সে এসেছিল, ন্যাড়া গায়ে, আঢাকা রূপের গরবে! কিন্তু কত সুন্দর ছিল সে! যদি সেদিনকার প্রগল্‌ভতাটা স'য়ে নিতে পার্‌তাম, তবেইত তাকে মুঠের ভিতর পেয়ে শাসনে আন্‌তে পারা যেত! এতদিন কি তার বিয়ে হয় নাই?

এ সব ভাবনা চিন্তার মধ্যেও, নলিনী অর্থের অনুসন্ধানের ক্রটী করে নাই। সেই যে পরের মেয়ে হ'তে, পিতা মাতা স্বজনেও তাকে এমনি অবহেলা করিল, তাহার অর্থহীনতা ইহার বড় একটা কারণ। নলিনী চেষ্টা করিয়া এখন শ'খানেক টাকা রোজগার করে। মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয়, মা বাপের কাছে কিছু টাকা পাঠায়! কিন্তু হইয়া উঠে না! পাঠাই পাঠাই করিয়া তাহা আবার খরচ হইয়া যায়!

এমনি সময়ে নলিনীর পিতা একদিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নলিনী দেখিল, বৃদ্ধ পিতার শরীর বড় কাহিল, যেন শুকাইয়া গিয়াছেন, পিতাকে দেখিয়া নলিনী ব্যথা পাইল! ভাবিল, আজ পিতার কাছে ক্ষমা চাহিবে। টাকা যা হাতে আছে, পিতাকে দিয়া দিবে! এই মনোভাবটা কথায় ফুটাইতে তাহার বিলম্ব হইতেছিল, তাহার চোক ফাটিয়া কান্না আসিতোছল।

পিতাই আগে কথা বলিলেন,—

"তোমার কাছে একটা কথা আমি জান্‌তে এসেছি।" পিতার রুক্ষ কণ্ঠস্বরে, নলিনীর বিস্রুত প্রায় অশ্রুবেগ প্রহত হইয়া ফিরিয়া গেল! স্নেহের প্রত্যাশায় তার প্রাণে যে কোমলতাটা ভাসিয়া উঠিতেছিল, তা যেন কি একটা দম্‌কা ঠাণ্ডা হাওয়ার জমাট বরফ হইয়া গেল।

পিতা আবার বলিলেন, "আমি জান্‌তে চাই, তুমি বিয়ে টিয়ে একটা কর্‌বে কি না ?"

একখণ্ড লোহার পরে আর খণ্ড লোহা দিয়ে ঘা মারিলে যেমন একটা নীরস কর্কশ ঠন্‌ করে শব্দ ছোটে, তেমনি ভাবে নলিনী তৎক্ষণাৎ জবাব দিল।

"যদি না করি ?"

"তুমি না কর, কর্‌বে না, কিন্তু তাই বলে আমি যামিনীর বিয়েটা ত না দিয়ে পারি না।"

"তা দেবেন !"

"তুমি বড়, সে ছোট, তোমার একটা হেস্ত নেস্ত জবাব না পেলে, লোকত ধর্ম্মত আমি দোষী হ'য়ে পড়ি ! জ্যেষ্ঠ থাক্‌তে কনিষ্ঠের বিবাহ শাস্ত্রেও বাধা আছে !"

"আমায় কি কত্তে বলেন ?

"তুমি যদি বিয়েই না কর, তবে অনুমতি দাও, যামিনী বিয়ে করুক। বংশের ধারাটা ত রাখ্‌তে হবে। আর যামিনী তোমার মত বড় বিদ্বানও নয়।"

"আমি অনুমতি দিচ্ছি, যামিনীর বিবাহ দিন।"

"এতে তুমি কিন্তু চিরতরে পতিত থাক্‌লে। শাস্ত্রের বিধি।"

"আমি পতিতই আছি ?"

"আচ্ছা !"

পিতা উঠিয়া চলিলেন। নলিনীর তাহাকে আর কিছু বলারই রহিল না। সে সেই আসনেই বসিয়া রহিল, কি যে ভাবিবে, তাহাও যেন সে ভাবিয়া মনে আনিতে পারিল না। চাকর এসে বলিল, "বাবু !

চা তৈরী।” নলিনী কোনও কথা না বলিয়া, জামাটা গায় দিয়া, ঘরের বাহির হইয়া গেল। ঘরে থাকা তার পক্ষে অসহনীয় হইয় উঠিয়াছিল।

---

(৬)

মৃণালিনীর পিতা হাওয়া বদলাইতে গিয়া আর ফিরিলেন না! সদ্যো-শোকাহতা মাতা কন্যাকে লইয়া স্বামীর ছাড়া বাসা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। পুত্রেরাও আসিল। তখন হিসাব করিয়া দেখা গেল, স্বর্গীয় বিনয় বাবুর ব্যাঙ্কে হাজার খানেক টাকা আছে, আর সকল দিকের দেনা জড়াইয়া আছে হাজার দশেক! এই দেনা পাওনার হিসাব মত শ্রাদ্ধের খরচ হইল,—গৃহিণীর কতকটা গয়না বাঁধা দিয়া! গয়নাগুলি তিনি বিশেষ আগ্রহে আঁকুড়িয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন, দুর্ভাগ্য মেয়ে মৃণালিনীর ভবিষ্যতের জন্য। কিন্তু পুত্রদের তখন কারুই নগদ টাকা বাহির করিবার সুবিধা ছিল না, কাজেই তাহা করিতে হইল।

তারপর দেনা শোধের উপায় কি?

মহাজনেরা এখন আর বিলম্ব করিতে চায় না। যা হয়, পরে দেখা যাইবে, আপাততঃ মা মৃণালিনীকে নিয়া দেশের বাড়ীতে গিয়া বাস করুন, এইরূপই স্থির হইল। মৃণালিনীর বিবাহের দায়ে বিপদ গণিয়া ভাইএরা কেহই মাকে, সুতরাং বোনকে ঘাড়ে লইতে চাহিলেন না। স্বামীর বাসাবাড়ী অচিরাৎ দেনার দায়ে বিক্রয় হইয়া যাইবে, এটা

নিশ্চিত বুঝিয়া বিধবা জননী অনূঢ়া কন্যাকে লইয়া তাঁর বড় সাধের শান্তি নিকেতন হইতে চিরবিদায় লইলেন।

মা অনেক কাঁদিলেন, কিন্তু মৃণালিনী একটুও কাঁদিল না। দেশের বাড়ীতে আসিয়া মৃণালিনীর সকলের আগে প্রয়োজন হইল, শৈলর সঙ্গে দেখা করা। শৈল স্বামীর ঘরেই থাকে, মাঝে মাঝে আসিয়া দুই একদিন মাত্র পিতৃগৃহে থাকিয়া যায়! শৈল আসিল, কিন্তু মৃণালিনী সহসা স্বাধীন ইচ্ছায় তাহার সঙ্গে দেখা করিতে গেল না। উনিশ বছরের আইবুড় এই দুরন্ত বেয়াদব মেয়েটাকে গ্রামের কেহই পছন্দ করিত না। এতকাল সহরের সুখে বাস করিয়া, রায়গিন্নী যে ধাড়ী মেয়ে সঙ্গে নিয়া আসিয়াছেন দরিদ্র পাড়াগাঁয়ের হাওয়াটা বিগড়ে দিতে, তাহাতে গ্রামবাসীর অনেকেই উষ্ণতা অনুভব করিয়াছে। মৃণালিনী বুঝিয়া সুজিয়া কারু সঙ্গে বড় মিলিতে যাইত না। কিন্তু শৈলর সঙ্গে না মিশিয়া কি থাকা যায়! শৈলত আসিতে পারে মৃণালিনীর সঙ্গে দেখা করিতে! সে অবশ্য শুনিয়াছে, মৃণালিনীরা দেশে আসিয়াছে, এতবড় বিপন্ন হইয়া! সন্ধ্যায় আসিয়াছে শৈল! একটা এতবড় শীতের রাত্রি কাটিয়া গেল! দুই সখীতে দেখা হইল না।

সে ছিল মাঘ মাস, বড় শীত পড়িয়াছে সারারাত্রি, ভোর হইয়াছে, তবু জগৎ সাড়া দিতেছে না, বাজ ডাকিয়াছে, কাক ডাকেনি! এত শীতে উঠিতে হয়, যার কোলে ছেলে কাঁদিয়া উঠে, যাদের ঘরে স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া বাধে, আর যাদেয় বাড়ীতে আটটার গাড়ির ডেলি পেসেঞ্জার আছে। আরও একজন ওঠে, যার বুকের ব্যথায় গরম এতটা যে, এতবড় মাঘের শীতেও তা ঠাণ্ডা হয় না। শৈল উঠেছে সবার আগে। শুধু আঁচল খানিতে গা ঢাকিয়া, শৈল মিণীর ঘরের দুয়ারে আসিয়া ছোট করিয়াই ডাকিল, "মিণী!"

মিণীও জেগেছিল ; এতবড় একটা শীতের রাত্রির ১৩ ঘণ্টা ঘুমিয়ে কাটাবার মতন আরাম তার এখন নাই। তাড়াতাড়ি মায়ের কোল ছেড়ে উঠে পড়ে ছুটে এসেই বলিল, "শৈল ! আয় !"

একি ? শৈল আর কথা বলিল না ! ঝপাং করিয়া মিণীর বুকের উপর পড়িয়া তার গলা জড়াইয়া ধরিয়া, তাহার বুকের মধ্যে মুকখানা লুকাইয়া শৈল ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। তার চ'কের জলে দুইজনের বুকই ভাসিয়া যায়, তবু তার কান্না থামিল না। মৃণালিনীও কাঁদিল ! পিতার শোকে, মায়ের ব্যথায় আপনাদের হীনদশায়, আর শৈলের বুকভাঙ্গা উচ্ছ্বাসে !

অনেক কাঁদিয়া অনেক কষ্টে শৈল প্রাণের আবেগ সংবরণ করিল। মৃণালিনী বলিল, "একি ? এমন করে কাঁদ্‌লি ?" শৈল কষ্টে উত্তর কারল, "কতকাল পরে দেখ্‌লাম্ তোমায় আজ এই ভাবে !" শৈলের আবার কান্না আসে !

আর একটু ফরসা হইলে মৃণালিনী শৈলবালার মুখশ্রী দেখে দুঃখ পাইল ! সে মুখ যৌবনের যোলকলায় ফুটিয়াছে কিন্তু শৈলর চিরদিনের সে উল্লাস বিভোর প্রফুল্লতা কই ? শৈল যে ছিল, শুভ্র হাস্যমুখী সন্ধ্যার বনমল্লিকা, ভোরের স্থলপদ্মের মতন এমন প্রফুল্লতা হীন পূর্ণতা তাহাতে আসিল কেমন করিয়া,—কেবল এই একটা দেড়টা বছরের মধ্যে !

সে সময়ে আর বেশী কথাবার্ত্তা না বলিয়া দুইজনেই একত্রে প্রাতঃ-কৃত্যাদি সারিল। তারপর শৈলের বাড়ীতে গিয়া দুইজনেই একত্রে জলযোগ করিল। শৈল স্বামীর বাড়ী হইতে আসিবার কালে, স্বামী তাকে একহাঁড়ি বাগবাজারের সন্দেশ দিয়াছিলেন ! শৈল তার অনেক গুলি দিল মৃণালিনীকে ! মৃণালিনী বলিল, "তোর বিয়ের সন্দেশ খাওয়া হয় নি, তবু তাই শোধ নিলাম তোর বরের দেওয়া সন্দেশ খেয়ে ! দূর

রাক্ষসি! আর কি খেতে পারি? তুইত স্বামীর ঘরে বেশ সুখে আছিস দেখি!

শৈলও যেন অগত্যা হাসিয়া বলিল "সুখে নয়? আমার গয়নাগুলি দেখেছিস্। শৈল বাক্স খুলিয়া, গয়না কাপড় দেখাইল। সে প্রায় পনর বিশ হাজার টাকার হইবে। গায়ে তার হাতে দুটী শাঁখা মাত্র! মিণী বলিল, "তুই এসব পরিস্না কেন?"

"সেখানে যেয়ে পরি, এখানে না।"

"তবে এখানে এনেছিস্ কেন?"

"না আন্‌লে তিনি ছাড়েন না!"

"এত ভালবাসেন তোকে?"

"বড় ভালবাসেন?"

মিণী দেখিল শৈলর নাসিকাটা যেন একটু কেঁপে উঠ্‌ল।

"তোর বরের বয়স কতরে শৈল?"

"তা কি জানি? বেশ দেখ্‌তে!"

"শুনেছি তার আগের পক্ষের একটী ছেলে আছে!"

"হ্যাঁ! বড় সুন্দর ছেলেটী! সেইত সে বাড়ীর রত্ন!"

"কত বয়স তার?"

"আঠার উনিশ হবে! তবু যেন কোলের ছেলেটী!"

"তোমায় আদর যত্ন করে?"

"করে না? তার আদর না পেলে কি আমি সেখানে থাকৃতে পারতাম! আমাকে দেখবা মাত্রই সে যে আমার উপরই সকল ভারটুকু দিয়ে বসেছে! তার নাম মণি! বড় অমূল্য মণি।"

শৈল এক্ষণে বেশ সামলিয়ে নিয়েছে। সে তার স্বামীর ঘরের বিস্তৃত খবর বিনাইয়া গোছাইয়া বলিতে লাগিল।

সে কলিকাতার একটা দোতালা বড়বাড়ী! কত দামী দামী জিনিষ-পত্র সেখানে সাজান! সেখানে দাস দাসী পাচক পোষ্য অনেকেই ছিল, বাড়ীর মালিক মাত্র দু'জন, স্বামী আর মণিমোহন! মণিমোহনই সেবাড়ীর সর্ব্বস্ব। স্বামীর প্রথম পক্ষের ছেলে। সে কলেজে পড়ে, বড় সুন্দর তার মূর্ত্তিটী, বড় মধুর তার স্বভাবটী। পিতা কলিকাতায় ব্যবসায় করে অনেক টাকা করেছিলেন, তখনও তার বয়স ও স্বাস্থ্য ছিল। সংসারে ভোগের সাথী কেউ রইল না, তাইতে তিনি দ্বিতীয় পক্ষ করিলেন। একা মণিকে নিয়ে তাঁর এতবড় দৌলত ভোগ করা চলে না। কেইবা সংসার গোছায়, কেইবা ছেলেটীর তত্ত্ব লয়! মণি তাতে একটুও আঘাত পায় নাই। যেন বড় খুসিই হয়েছিল! আমাকে দেখে মণির চক্ষু প্রথম প্রথম ছল ছল করিয়া উঠিত; বুঝি তার মায়ের কথা মনে পড়িত। মাঝে মাঝে আমার কাছে আসিত। আমিত নতুন নতুন তার সঙ্গে কথা বলিতে পারি নাই। একটা কে মুখ বোলা গোছের মামাত বোন এসেছিল, তার কাছেই থাক্‌তাম! আর চুপে চুপে কেঁদে কাটাতাম্! সে মাগীটা আমাকে বড় জ্বালাতন করে তুলেছিল। এইত এতবড় বাড়ী, জুড়ি গাড়ি, লাখ্ লাখ্ টাকা ব্যাঙ্কে জমা, রাজার সুখে থাক্‌বে! ইত্যাদি ব'লে ব'লে আমার বড় জ্বালা বাড়িয়ে দিত! একদিন মণি এসে বল্ল কত ধীরে! কত মধুরে! মা! আমি ছেলে, আমার সাথে কথা বল্‌তে লজ্জা কি? আমি মাথার ঘোমটা খাটো করে দিলাম। মণি বলিল, আমি সন্তান, মা-হারা ছেলে, বড় দুঃখী! আমায় ভাল বাস্‌তে হ'বে। এমন অকপট কাতর কণ্ঠ আর কোন দিন শুনি নাই! প্রাণ যেন দিব্য আলোকময় হয়ে উঠলো! যা কিছু অশান্তি অবসাদ এসেছিল, তা যেন কোথায় উড়ে গেল! তখনই যেন সে বাড়ীর সাজ সজ্জা ছবিগুলি তাদের রূপ গুণ নিয়ে জ্বলে উঠ্‌লো,

এতক্ষণ ছিল সেগুলি নেহাৎ আঁধার জড়ান অকেজো বাজে মালের মত পড়ে। পাখাগুলি ঘুরে বাতাসটা ছুটে এলো আজ বড়ই মিষ্টি! সেইদিন থেকে মণির সঙ্গে কথাবার্ত্তা বল্‌তে লাগ্‌লাম্! তার সেবা যত্নে মন দিলাম। সতীনের ছেলে নাকি শত্রু হয়! আমি মত তা বুঝ্‌লাম না! মণি তার ছোট বড় সব প্রয়োজনটাই আমার উপর চাপাতে আসে, আমি সাদরেই মাথা পেতে নি। এখন আমি জলখাবার সাজিয়ে না দিলে সে খায় না, খাবার সময়ে আমাকে কাছে বস্‌তে হয়, বড় গরম লাগ্‌লেত, পাখাটা খুলে না দিলে, সে খুলে বসে না। এই ত দুদিনের জন্য এসেছি কত কষ্ট হচ্ছে তার! আস্‌তে চেয়েছিল আমার সাথে, বড় মানুষের ছেলে, পাড়া গাঁয়ে গরীবের বাড়ী আস্‌লে কষ্ট পাবে, তাই আন্‌লাম্ না।

মৃণালিনী শৈলর গল্প শুনিয়া শুনিয়া যেন একটু তিক্ত হইল, বলিল, "দূর পোড়ার মুখী! কেবলইত ছেলের গল্প করে যাচ্ছিস্, যার ছেলে তার কথাত কিছু বল্‌ছিস্ না! বল্ স্বামী কেমন হয়েছে? কেমন ভাল বাসে!"

শৈলর আলো মুখখানা যেন একটু কাল হইল। বলিল, "যে চল্লিশ বছরে বিয়ে করে, সে কি বউ ভাল না বেসে পারে? সে যে কেবলই আদর, অবিচ্ছেদী যত্ন! শোন্ তবে একটা দিনের কথা! একটা কাঁচের গ্লাস আমায় পায়ের কাছে পড়ে একদিন ভেঙ্গে গেল! তিনি ছিলেন, পাশের ঘরে, ছুটে এসে দেখেই বল্লেন, আহা পায়ে লাগ্‌লো নাকি? কাচের বিষ, বড় বিষ, যদি কেটে ফুটে যেয়ে থাকে, এখনি ডাক্তার ডাকৃতে হবে। একটু আঁচড় লাগ্‌লেও তুচ্ছ করতে নাই। আমায় একটুও লেগে ছিল না। বেচারীর তবু শান্তি নাই, আমার পায়ের তলাটা পর্য্যন্ত হাত দিয়ে না দেখে তার শান্তি হলো না! সে কত

ভালবাসা ! আমার কপাল ভাল নয় দিদি ! সে গ্লাসটা এনেছিল মণি সখ্ করে, তার আগের দিনই, সরবৎ খেতে। আমার ভাবনা হয়েছিল, সে কি এসে আমায় বকে !

মৃণালিনী আর শুনিতে চাহিল না। তার মুখের ভাবটা বিশ্রী হয়ে গেল ! সে খানিকটা ভাবিল ! তখন রোদ উঠেছে, সকলে শয্যা ছেড়েছে। মিণী উঠে যাবার সময় বলিল, "তাইত দেখ্ছি, ভগবান এ জগৎ-শুদ্ধ মেয়ে মানুষ গুলিকে গড়েছেন, সয়ে নেবার শক্তি দিয়ে ! তারা এত বড় পাহাড়ের চাপগুলি স'য়ে নিচ্ছে, আর আমি কেমন স্মৃষ্টিছাড়া ! সইতে বইতে যাবনা আমি কিছুই। শৈল, স'য়ে নেবার শক্তি তোর আছে ! তবু সাবধান ! যাব তোর বাড়ী দেখ্তে একবার !"

"চলনা তয়ে, পরশুইত আমি যাব, আমার সাথে। দেখে আস্বে, মণি কেমন মণি ?"

"মণি সাপের মাথারই মণি ! তা থা'ক্, আমি তোর সাথে যাব কেন ? যাব একদিন আপনি স্বাধীন ভাবে।"

বলিয়া মৃণালিনী বাড়ী গেল। শৈল আর আর আর পড়শীর বাড়ী বেড়াতে গেল।

---

(১০)

মৃণালিনী মাকে বলিল, "মা ! দাদার বাসায় যাও, আর এখানে থেকে কষ্ট পেয়ে লাভ কি ? লাভের মধ্যে লোক গঞ্জনা।"

মা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্লেন ; "তারা এ গলগ্রহের ভার বইতে চায় কই ?"

"চায় না. ত আমার ভয়ে ! সত্যি মা, আমার ভারটা বড় বেশী। উনিশ বছরে আইবুড় মেয়ে আমি, আমার বিয়ে দেবার ভারটা সহজ ভার নয়। যদি বিয়ে না দাও, . লোকের গঞ্জনা। আমিত বেশ দেখ্‌ছি, রাস্তার চাষারা ও ঘাটে পথে আমায় দেখ্‌লে চোক্ বাঁকা করে চায় ! কিন্তু মা আমি কিন্তু একটা স্থির করেছি !"

"কি ?" বলিয়া মা চাইলেন মেয়ের মুখের দিকে ! দেখিলেন সে মুখ সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় স্থির, সামান্য মাত্র সন্দেহ বা দ্বিধার একটু চঞ্চলতাও তাহাতে নাই, নির্ব্বাত আকাশের তলে ভাদ্রের ভরা নদীর মত মৃণালিনীর পূর্ণ-যৌবনায়ত অঙ্গটা একবারে নিস্তরঙ্গ ! মেয়ের ভাব দেখিয়া মা শিহরে উঠিলেন। মেয়েটাকে যে তিনি এই উনিশ বছর বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছেন। খাবারটা একটু বিস্বাদ অরুচিকর হইলে, শত অনুরোধেও তাকে কোনও দিন খাওয়ান যায় নাই, শত সাবধান করে দিলেও, কোনও রূঢ় সত্য বলিতে তাকে নিবৃত্ত করা যায় নাই ! এই

দুরন্ত প্রখরা মেয়ের ভারটা তাঁর উপর চাপিয়ে রেখে স্বামী সংসার পারে লুকাইলেন, এ নিষ্ঠুরতায় তার বুক ফেটে কান্না আসিতেছিল। তিনি বলিলেন, "কি একটা বাহানা ধরেছিস আজ আবার?"

মৃণালিনী মুক্তকণ্ঠে কহিল, "মা! আমার যা বাহানা, তাই সঙ্কল্প, অনর্থক খেয়ালে আমি মাতি না। এখানে মেয়েগুলি কি এমন আবর্জ্জনা? বাপ মার বড় ভার বোঝাই মেয়ে! ভাই চায় না বোনের ভার বইতে! যে সংসারে মেয়ের দল বেশী জুটে যায়, সেই সংসারই হয় অলক্ষ্মীর অধিষ্ঠান। আমি দেখাতে চাই, ঠিক তাই নয়। মেয়ে কারু উপর ভর না রেখেও দাঁড়াতে পারে। তুমি যাও, দাদার বাসায়! তা হলে আমার বড় স্বস্তি হবে! যেতে হবে তোমায়!

"আমি যাব, তুই?"

"আমি কল্‌কাতায় যাব,—পড়্‌তে না হয় চাকরী কর্ত্তে?"

"বলিস্‌ কি?"

"হ্যাঁ মা তাই স্থির করেছি! এ দোটানা ভাব আর ভাল লাগে না। আমরা হিন্দু, আবার অহিন্দু! সহুরে, অথচ পাড়া গেঁয়ে! লেখা পড়া কিছু শিখেছি, উনিশ বছরেও বিয়ে করিনি, অথচ পাড়া গাঁয়ে থেকে লোকের গঞ্জনা খাচ্ছি। হয় চল সেই সেকালে ফিরে,—মুনির তপোবনে গিয়ে তপস্যা করি, না হয় যাব আমি অহিন্দু সমাজের স্বাধীনা মেয়ে হয়ে!"

মা চেয়ে রইলেন, মেয়ের মুখপানে। মেয়ে সেখান থেকে চলে গেল। মা একটু ভেবে চিন্তে স্থির হয়ে, মৃণালিনীর কাছে গিয়ে বল্লেন, "মিণী! আমি একটা স্থির করেছি। তোর সেই জ্যাঠা মশায়ের কাছে একখানা চিঠি লিখে দে।"

"কোন জ্যাটা মশাই? বলাই জ্যাঠা?"

"হ্যাঁ! তোকে বড় ভালবাসেন। আমরা দেশে এসেছি, তা তিনি

জান্‌তে পারেন নাই। জানিস্‌ত, সেই সর্ব্বনেশে খবরটা পেয়েই ছুটে এসেছিলেন! কত কেঁদেছিলেন ভায়ের জন্য! দে একখানা চিঠি লিখে দে।"

"তিনি সংসারের ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে আনন্দে উড়ে ছুটে বেড়াচ্ছেন। তাঁকে আর এ বয়সে বিরক্ত ক'রে কি লাভ ?"

"তিনি কত ভরসা দিয়ে গিয়েছিলেন সেই যাবার সময়।"

"হ্যাঁ, বলে গিয়েছেন, মিণীর বিয়ের জন্য ভাব্‌তে হবে না। ভগবান উপায় কর্‌বেন। তিনিত মা নিজে কিছু করেন না, সকলই ভগবানের উপর ভার দিয়েছেন। তাঁকে না ডেকে তাঁর ভগবান্‌কে ডাকাইত ভাল।"

"তাত ডাকছি, ভগবান মুখ তুলে চান কই ?"

"তোমারত মুস্কিল হচ্ছে, আমার বিয়ে নিয়ে! আমিও বল্‌ছি ভগবান আমার বিয়ে জুটিয়ে দেবেন। আমার যখন বিয়ে করবার ইচ্ছা আছে, তখন তাঁকে জুটিয়ে দিতেই হবে,—একটী সুপাত্র! এইত শৈলর জুটে গেল রাজার মতন বর! তোমার হাতেত এখনও দু'হাজার টাকা আছে, তার অন্ততঃ গোটা দশেক টাকা আমায় দিতে হবে, আমি কল্‌কাতায় যাব।"

"বলিস কি ? কল্‌কাতায় তুই একলা যাবি ?"

"একলা যাব কেন ? তুমিও চল! তুমি দাদার বাসায় যেও। আমি সেখানে যেমন করে হোক্‌ একটা আশ্রয় করে নেব; জানত মা, তোমার যেবার বড় ব্যামো, সেই ছেলেটা হয়ে মারা গেল। তোমার চিকিৎসার জন্য একটা মেয়ে ডাক্তার এসেছিল। তার সঙ্গে আমার ভাব হয়েছিল। তার ঠিকানাটা ভুলে গেছি, যে রকমে হোক তাকে খুঁজে নেব, তার সাহায্যে আমি ধাই গিরি করা শিখবো! কত রোগী আতুরের সেবা কর্ত্তে পাব!"

মিণী একটু ভেবে আবার বলিল, "না মা, তোমায় দাদার বাসায় গিয়ে কাজ নেই। সেখানে গেলে, তোমার হাতে যে দু' হাজার টাকা আছে,—যা নিয়ে তোমার ভরসা—আমার বিয়ে দেবে, তা থাকবে না দাদার খরচ চলে না। সন্তানের অভাব দেখ্‌লে তা তুমি রাখ্‌তে পারবে না। তোমার গিয়ে কাজ নেই। সে টাকা ক'টী গেলে তুমি বাঁচ্‌বে না। ভেবে চিন্তে দেখি কি করা যায়! একটা কিছু করবই!"

মৃণালিনী সে দিন খুব ভাবিল। সারাদিন ধরে ভাবিল, রাত্রিতেও ভাবিল। বাস্তবিক কি নারী জীবনটা এমনিই অসার! স্বাধীন পায়ে দাঁড়াবার তার একবারেই অধিকার নেই? বিয়ে না হ'তে উনিশ বছর পার হয়েছে, তাই ত এত গঞ্জনা! সারা দুনিয়ার চোক্‌গুলিই তার দিকে তাকিয়ে থাকে,—উপহাসের দৃষ্টিতে! পাড়ার নচ্ছার ছেলে-গুলি রাক্ষসের মতন লালসার নেত্রে তার উপর কটাক্ষ করে! কসা মেরে তাদের পিঠে রক্ত বার করা উচিত নয়? আমার সাহস হয় এদের সুমুখে বীর মুখে দাঁড়াতে! ইচ্ছা করে বুঝিয়ে দিতে—রে হতভাগারা! যে নারী নিয়ে খেল্‌তে যাস্‌ নরকের খেলা; সেই নারীই তোদের মা হয়ে দুনিয়ায় এনেছে, বোন হয়ে আদরে তোদের প্রাণে কত সুধা ঢেলেছে,—পত্নী হ'য়ে সোহাগে সংসার মধুময় করে দিচ্ছে! তাদের নিয়ে যাস এমনি ছিনি মিনি খেল্‌তে! পারি আমি সব! পারি না কেবল, মা ভাইএর মাথা হেট হবে বলে,—বংশে একটা কেলেঙ্কারী রট্‌বে ব'লে!

রাত্রি তখন অনেক। মাঘের আকাশ মেঘে ছেয়েছে, শীত বড় কম। মৃণালিনীর নিদ্রা আসে নাই। বাহিরে যেন একটা কিসের শব্দ হইল। মায়ের কিছু টাকা সঞ্চিত আছে। চোর টোর আস্‌ল নাকি! দুঃখের শরীর মার, কত কষ্টে ঘুমিয়েছেন, তাকে ডেকে তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে কাজ নেই। দেখি না দোর খুলে বাহিরে গিয়ে। চাকরটা ত বাহিরে শুয়ে

আছে। মৃণালিনী দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল! তখনই দম্‌দাম করিয়া পাঁচ ছয় জন লোক, তাদের সাহেবের সাজ পরা, খোলা দরজা পেয়ে ঘরে ঢুকে পড়্‌লো। আর দুইজন বাইরে মৃণালিনীর হাত ধরে, এক ভক্ তকে ছোরা বুকের উপর উপর রেখে বল্ল, "মৎ চিল্লাও, এই ছোরা দেখ।" যারা ঘরে ঢুকলো তারা তাড়াতাড়ি বাতি জ্বালিল। মৃণালিনীর মাও তখন উঠেছেন! একটা রিভলবার তার দিকে ঘুরিয়ে বল্ল, যা আছে খুলে দাও, সিন্ধুকের চাবি দাও, চেচামেচী কল্লেই খুন হবে। মা কাঁপিয়া বসিয়া পড়িলেন, তবু ডাকিলেন, "মিণী! ও মিণী?" ডাকাতের একজন বলিল, তোমার মেয়ের বুকে ঐ ছোরা খাড়া। গোলমাল কল্লে, ঐ ছোরা ওর বুকে বস্‌বে।

তারপর ডাকাতেরা চাবি লইয়া সিন্ধুক খুলিয়া, টাকা পয়সা, সোণা রূপা যা পাইল, সব লইল! পাঁচ মিনিটের মধ্যে এই ব্যাপার সম্পন্ন হইল। দস্যুরা লুণ্ঠিত দ্রব্য গোছাইয়া যখন চলিয়া যায়, তখন মৃণালিনী ছোট করিয়া বলিল, "আমার মার সর্ব্বস্ব যখন কেড়ে নিলেন, তখন আমায় রেখে যাচ্ছেন কেন নলিনী বাবু?"

পলকের জন্য দস্যুদল থম্‌কে দাঁড়াল! একজন মৃণালিনীর কাছে এসে চুপে চুপে বলিল, "যাবে তুমি?" মৃণালিনীও চুপে চুপে বলিল, "যাব!" "এসো তবে!" বলিয়া দস্যু মৃণালিনীর হাত ধরিল। নিশা-বিষ্টের ন্যায় দস্যু মেয়েটা সেই দস্যুদলের সঙ্গে তাদেরই মত জোর পায়ে হাটিয়া চলিল!

মার যখন সংজ্ঞা আসিল, তখন দেখিলেন তার কিছুই নাই! মেয়েও নাই! মিণী! ও মিণী! মৃণালিনী! কোথায় মৃণালিনী? মায়ের বুক-ভাঙ্গা চীৎকারে পাড়া জাগিল, মৃণালিনী ফিরিল না।

প্রকৃতি শূণ্যকে ঘৃণা করেন। কথাটা বৈজ্ঞানিকের মুখ দিয়া বাহির হইলেও, আধ্যাত্মিক ভাবে এ সূত্রটা অতি সত্য! একটা কিছু নিয়ে মানবপ্রকৃতির থাকিতেই হইবে। নলিনী রঞ্জনের যখন রক্ত সম্বন্ধীয় কাহারও সঙ্গে সম্বন্ধই রহিল না, তখন আর পাঁচ জন বাজে সঙ্গীর সঙ্গে তাহাকে সম্বন্ধ পাতাইয়া নিতেই হইল! এমন অবস্থায় কু-সঙ্গীই জুটিয়া যায়। যাহারা সঙ্গী জুটিল, তাহারা অর্থ নীতির একটা অকাট্য যুক্তির অবতারণা করিল। এইত শত শত লোক তেতালা চৌতালা তুলিয়া স্তূপীকৃত অর্থের মধ্যে বিলাসের শয্যা বিস্তার করিয়া আছে, আর আমরা নাড়ী ছেড়া ক্ষুধায়ও পেট পুরে খেতে পাই না, এটা সংসারের নিতান্ত অবিচার। সকল অর্থবান্ বিলাসীর অর্থ যে শুদ্ধ গঙ্গা জলে ভেসে আসে নাই,— অন্যায় অধর্ম্ম হইতে নিতান্ত অসঙ্গত সুবিধাটা অনেকেরই ভাগ্যে জুটিয়া গিয়াছে, এমন ইতিহাসও তাহারা অনেক সংগ্রহ করিয়াছে। সুতরাং; সংসারে লুটিয়া খুটিয়া খাওয়াটাই জীবধর্ম্ম, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এমনি করিয়া একটা দল গড়িয়া উঠিল। নলিনীও তাহাদের সঙ্গে স্রোতে সাঁতার কাটিল। তাহারই কেবল আগে সে খুজিয়া আসিয়াছিল, মৃণালিনীর বর্ত্তমান অবস্থা! তাহার পর সেই ডাকাতি!

দস্যুদল মাইল তিনেক পথ সেই গভীর অন্ধকারে, বন জঙ্গলের ভিতর দিয়া ছুটিয়া পাড়ি দিল। মৃণালিনীও খানিক পথ তাহাদের সঙ্গে দৌড়িয়া ছুটিল, কিন্তু মাঝ পথে অবশ অবসন্ন হইয়া পড়িল! দস্যুদের মধ্যে একটা বড় যোয়ান ছিল, সে তাকে ঘাড়ে তুলিয়া লইল,

একটা গভীর' অরণ্যে তারা বিশ্রাম করিতে বসিল। এতক্ষণ তাহাদেরও সংজ্ঞাটা বোধ হয় ঠিক পথে ছিল না। একটু বিশ্রামের পর একজন বলিল,—সর্ব্বনাশ করেছিস্, মেয়েটাকে নিয়ে এলি কেন?"

আর এক জন বলিল, তাইত, মেয়ে মানুষেরত আমাদের কোনও দরকার নেই। এ যে ধরা পড়ার সহজ পথ!"

আর এক জন বলিল, "ভয়ানক ভুল হয়েছে।"

নলিনী বলিল, "ও নিজে এসেছে!"

"সে থাকৃগে, এইখানেই ভুল সেরে নেওয়া যাক।' বলে একজন রিভলভারটা মৃণালিনীর মাথায় লক্ষ্য করিল! নলিনী তার হাত ধরিয়া বলিল, "না না স্ত্রী হত্যা করো না।"

"তা না হলে যে এতগুলি নরহত্যা হয়! ও হতে যে সব ধরা পড়্‌বো।" বলিয়া পাষণ্ড লোকটা হাত ছিনাইয়া লইল।

নলিনী বড় কাতরেই বলিল, "না না রক্ষা কর। এ মেয়ে আর কারু চেনে না। কেবল আমাকেই চেনে, যেতে হয়, আমি যাব, তোমরা পালাও।"

"তোরে চেনে? তবে এলি কেন এখানে।"

"একদিন মাত্র দেখেছিল, আজ এ ছদ্মবেশেও যে চিনে ফেলবে কে জানে?"

"যা'ক সে কথা, এখন নারী হত্যা স্নেহ মমতার বিচার করবার সময় নেই। সেরে দাও শিগ্‌গির করে।" আর এক জন রিভলভারটা হাতে নিতে হাত বাড়াইল।

নলিনীই বন্দুকটা কাড়িয়া হাতে লইল! "পালাও, স্ত্রী হত্যা করতে কিছুতেই পারবে না।" তার পর একটু দূরে সরে গিয়ে বল্ল, "পালাও, আমি কথা দিচ্ছি, তোমাদের কোনও ভয় নাই। সমস্ত

বিপদ আমার ঘাড়ে। আর না পালাও, আমি এই রিভলভারে তোমাদের যে ক'জন পারি খুন কর্‌বো।—এই পর মুহূর্ত্তেই ! পাঁচ গুলিতে পাঁচ জন খুন হবে নিশ্চয়ই।"

একজন পালাইল! সকলই সেই পথ সমীচিন মনে করিল। নলিনী ছাড়া সকলেই পালাইয়া গেল। মৃণালিনীর তখন সংজ্ঞা আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার কর্ম্মেন্দ্রিয়ে কার্য্য-শক্তি ছিল না।

নলিনী ডাকিল "মৃণালিনী ?"

"এঁ্যা।"

"কেন এলে তুমি ?"

"জানি না!"

"আমাদের ধরিয়ে দিতে ?"

"না।"

"আমিত ধরা পড়েছি।"

"উপায় কি ?"

"উপায় তোমাকে মেরে এই বনমধ্যে ফেলে যাওয়া!"

"তা বুঝ্‌তে পেরেছি,—কিছু কিছু শুনেছি। তাই করুন, আপনি বাধা দিলেন কেন ?"

"না, তা আর করবো না। কিন্তু একটী শপথ কর্ত্তে হবে।"

"কি ?"

"আমরা ধরা পড়্‌ব নিশ্চিতই। তুমিই প্রধান সাক্ষী। আমার কাছে শপথ কর, এক আমাকে ছাড়া আর কাউকে তুমি সনাক্ত করবে না।"

মৃণালিনী এতক্ষণে একটু সবল হইয়াছে। সে উঠিয়া বসিল। তার পর বলিল, "আপনাকে সনাক্ত করিব ?—তার পর ?"

"তার পর আর কি? আমার বছর পাচেকের জেল হবে! আর সব বেচে যাবে।"

"আমি যদি কাউকে সনাক্ত না করি!"

"তা'ও তুমি পার, কিন্তু এতটা পেরে উঠ্‌বে না!"

নলিনীরঞ্জন লুকাইতেছিল। মৃণালিনী উচ্চকণ্ঠে বলিল, "কোথা যান্ আমাকে একলা ফেলে?" নলিনী ফিরিয়া বলিল, "রাত ভোর হতে দেরি নাই। ভোর হলেই বাড়ী যেও।"

"আমায় আন্‌লেন কেন?"

"তুমি নিজে এসেছ, আমরা কি এনেছি? তবে সে সময় কেউ ভাবি নাই, তোমাকে আনায় বিপদ আছে।"

"আপনারা কোথায় থাকেন?"

"আমাদের ধরিয়ে দেবার অত সহজ পথ তোমায় বলে দেব না।"

"আপনার পায়ে পড়ি, আমায় একলা ফেলে যাবেন না।"

"কি জ্বালা! তুমি এলে কেন?"

"আমায় সাথে করে নিয়ে যান?"

"কি জন্যে? স্ত্রীলোকের আমাদের কোনও প্রয়োজন নাই।"

নলিনীরঞ্জন আর দাঁড়াইল না। আঁধারের মধ্যে মিলিয়া গেল! নিঝুম তৃতীয় প্রহর রাত্রিতে গভীর অরণ্যে বঙ্গকুলবালা মৃণালিনী একাকিনী! সে ভাবিয়া উঠিতে পারিল না, এখন সে কি করিবে? এমন একটা অসম্ভব বেখাব অবস্থার মধ্যে সে কেমন করিয়া আসিয়া পড়িল? দস্যু বলিল, আমি নিজে এসেছি, তারা আনে নাই। তাই বা কেমন করে ঘটিল? তারা যে আনে নাই, তা ঠিক; আমি নিজেই এসেছি, এমনটা যেন মনে পড়ে! ঐ নলিনীরঞ্জন আমায় বর সেজে

আমার দেখ্তে এসেছিল। এতবড় সাহেব সেজে, রং মেখে সে এসেছিল, তবু আমি তাকে চিনে ফেলেছিলাম। ও যে শিক্ষিত বি, এ পাশ ভদ্রলোক। এমন হীন কাজে মতি হলো ওঁর!.আমি ওঁকে বড় অপমান করেছি, পদে পদে, তারই প্রতিশোধ নিতে এসেছিলেন। কিন্তু এখন করি কি?

দেহ ও মন দুই-ই অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল! অতি নিকট দিয়া কি একটা বড় জানোয়ার দৌড়িয়া গেল, তার গায়ের দুর্গন্ধ নাকে লাগিল। শেষ রাত্রির শিশিরে গা মাথা ভিজিয়া গিয়াছে। শ্রমের উষ্ণতা দমিয়া গিয়াছে, মাঘের রাত্রির শীতে শরীর আড়ষ্ট করিয়া আনিতেছে! মৃণালিনী আবার চেতনা হারাইল। এ অবসাদও একরূপ নিদ্রা, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিশ্রাম! শৃগালদল বিকট হুলুধ্বনিতে যখন প্রত্যূষের সাড়া দিল, তখন আবার মৃণালিনীর চৈতন্য আসিল! এবার তার খাঁটি চৈতন্যই আসিয়াছে। মৃণালিনী কাঁদিয়া উঠিল! ভোর হইয়াছে, এখন আর ভয় না থাকাই সম্ভব, কিন্তু এখন ভয় আরও বাড়িল। দিনের আলোক দেখা দিয়া, তাহাকে আতঙ্কে রোমাঞ্চিত কম্পিত করিয়া দিল। জঙ্গলটার ভীষণতা তাহার চক্ষে প্রত্যক্ষ অনুভূত হইল। কি নিবিড় ভীষণ জঙ্গল! গাছে গুল্মে লতাপাতায় জড়িয়া, সেখানটার বাহিরের দৃষ্টি একবারে রোধ করিয়া রাখিয়াছে। এখান থেকে কোন্ পথে গেলে যে লোকালয় পাইব, তাহাত বুঝিবার উপায় নাই। আর লোকালয়ে কি তাহার স্থান হইবে। উনিশ বছরেও তাহার বিয়ে হয় নাই, তা না হয় লোকে সয়েছিল। কিন্তু ডাকাতে ধরে নিয়ে যাকে এক রাত্রি রেখেছে, এখন লোকালয়ে গেলে, লোকে যা বল্বে, তা স'য়ে সে লোকালয়ে থাক্বে কেমন করে? তবুত তাকে যেতেই হবে লোকালয়ে, যদি বাঁচতে হয়। বাঁচ্তে হবে বইকি? সে যে পুরুষকে দেখাতে চায় নারীর

নারীত্ব! তবে যে কলঙ্ক শত সত্য হলেও পুরুষের গায়ে দাগ লাগেনা, মিথ্যা এ কলঙ্কে এ তার এত আশঙ্কা কেন?

মৃণালিনী বল করিয়া বনের বাহিরে আসিতে লাগিল। বাহিরে আসিলেই লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। রায়ের বাড়ীর ডাকাতির কথা ও মেয়ে চুরির কথা রাত ভোরেই রাষ্ট্র হইয়াছিল অনেক দূর! যাহারা মৃণালিনীকে প্রথম দেখিল, তাহারা তাহাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিল।

---

(১২)

ডাকাতির তদন্ত খুব জোরেই হইল। বলদেব জ্যাঠা খবর পাইয়া ছুটিয়া আসিয়াছেন। মৃণালিনীর ভ্রাতারাও আসিলেন। আসামীর কোনও সন্ধানই হইল না। মৃণালিনী বলিল, সে আসামী কাউকেও চেনে না। আসামীরা তাহাকে জোর করে নেয় নাই, সেই নিজে গিয়াছিল তাদের পিছনে। পথে তাকে তারা গুলি করে মারতে গিয়েছিল, তা দেখে সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। তার পর ডাকাতেরা কোথায় গেল সে জানে না। ফরিয়াদী যখন, আসামীর সন্ধান করিয়া দিতে পারিল না, তখন আর পুলিসের কর্ত্তব্য কি রহিল। অধিকন্তু তাহারা রিপোর্ট করিল; এ ডাকাতির ভিতর একটা কিছু গূঢ় রহস্য আছে। গৃহস্বামিনীর বয়স্থা যুবতী কন্যা অবিবাহিতা, তাহাকেও ডাকাতেরা নিয়া গিয়াছিল। সুতরাং এই যুবতী কন্যার রূপযৌবনের প্রলোভনই এই ডাকাতির মূল কারণ। অর্থাদি অপহরণের কথা বিশ্বাস হয় না। গৃহস্বামিনীর কত টাকা চুরি গিয়াছে ঠিক হইল না। গৃহস্বামিনীও

ঠিক বলিতে পারেন না, কত ছিল, কত গিয়াছে, যুবতী মেয়েটা এক রাত্রি ডাকাতের সঙ্গে বাস করিল, অথচ তাহাদের কাউকে চিনেনা এই উক্তিতে কেমন গোলমাল আছে বলে মনে হয়, ইত্যাদি।

ইহার ফল এই হইল, মৃণালিনীর বিবাহ দিবার যে ক্ষীণ আশাটা মায়ের মনে ছিল, তাহাও লুপ্ত হইয়া গেল। সংস্থান যা ছিল, সবই গেল। এদিকে চারিদিকে এমন কি সংবাদপত্রে পর্য্যন্ত রাষ্ট্র হইল, একদল ডাকাত মৃণালিনীকে চুরি করিয়া নিয়া একরাত্রি তাহাদের সহবাসে রাখিয়াছে, মৃণালিণী উনিশ বছরেও অবিবাহিতা, তারপর এতবড় ঘৃণিত কলঙ্ক, কোন্ হিন্দু তাহাকে কুলে গ্রহণ করিয়া কুল অপবিত্র করিবে?

মাতা সেই যে ডাকাতির রাত্রিতে গতচেতনা হইয়াছিলেন, তারপর আর মাথা তুলিতে পারিলেন না। ছেলেরা স্ব স্ব কার্য্য ছাড়িয়া বেশীদিন মায়ের মরণ তরণের অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তাহাকে এ অবস্থায় বাসায় নেওয়াও সুবিধা জনক নয়। কাজেই মৃণালিনীর উপর রাখিয়া তাহাদিগকে মায়ের কোল ছাড়িয়া চাকরীর কোলে যাইতে হইল! কেবল রহিলেন সেই বলাই দাদা! তিনি স্থির করিয়াছেন, বুড়ীকে গঙ্গায় না দিয়া তার যাওয়া হইবে না।

তারই দুই একদিন পরে মা সকল জ্বালা এড়াইয়া শেষ নিশ্বাস ছাড়িলেন! মৃণালিনী খুব আছাড় খেয়ে কাঁদিল না! তবে তারই জন্যই যে এত শীঘ্র তার মা দেহ রক্ষা করিলেন, সেইটাই হইল তাহার বড় দুঃখ। আর কেহ কিছু না জানুক, সেত নিজে বুঝ্‌তে পেরেছে, সে নিজেই ঘরের দরজা খুলে ডাকাত ঘরে এনেছিল, নিজেই গিয়েছিল তাদের সাথে। তাইত মায়ের সর্ব্বস্ব গেল, তার নামেও কলঙ্ক রটিল। সে কেবল ভাবিল, তার এই ক্ষুদ্র জীবনটা এতগুলি অভাবনীয় ব্যাপারের

মধ্যে এত অল্প সময়ে পড়িল কিরূপে? একি ভগবানের নিরূপিত প্রাক্তন কর্ম্মের ফল, না ঘটনাবশে এমনি ঘটিয়া গিয়াছে। সে মায়ের জন্য কাঁদেও বটে, ভাবেও বটে—মা এমন সময় চলে যেয়ে জ্বালা জুড়িয়েছেন, থাকলে তাকে আরও কত জ্বল্‌তে হতো।

মৃণালিনীর মা মারা গেলে, আর একটা বিপদ ঘটিল। গ্রামের কেহই তাঁর শব ছুঁতে সম্মত হইল না। তিনি যে বিশুদ্ধ হিন্দুজাতির মধ্যেই ছিলেন, তাহাতে সকলেরই সন্দেহ, বলদেব বলিলেন, প্রায়শ্চিত্ত করাও, মৃতেরও ত প্রায়শ্চিত্ত আছে। সে প্রায়শ্চিত্তের বিধি কেউ দিতে পারিলেন না। অন্য গ্রামে বড় পণ্ডিতের কাছে যাইতে বলিলেন।

মৃণালিনী বলিল, "তা হোক্, জ্যাঠা মশাই। আমরা দুজনেই মাকে শ্মশানে নিয়ে যেতে পার্‌ব।"

তাই হইল, বৃদ্ধ বলদেব আর মৃণালিনী দুই জনেই গ্রামের প্রধান বিনয় রায়ের বিধবাকে শ্মশানস্থ করিল। পুত্রেরা পরদিন বাড়ী আসিয়া ধড়া পরিল ।

এখন মৃণালিনীর কি করা যায়? বলদেব তার ভাইদের সঙ্গে এই বিষয়েই আগে স্থির করিতে চাহিলেন। তাহারা এ বিয়ের একটা কোনও নিশ্চিত মীমাংসায় আসিতে পারিল না। বড় ভাই বিলাত ফেরত ব্যারিষ্টার সবে এই নূতন। তাহার আয় উপার্জ্জন এমন একটা কিছু নয় যাহাতে সে ভগিনীর ভারটা মাথায় নিতে পারে। তাহাকে থাকিতে হয় অভিজাতের আড়ম্বরে। ভগিনীকে নিজের করিয়া রাখিতে হইলে, তাহায় আভিজাত্যের অনুরূপ ভাবেই তাহাকে পুষিতে হইবে। তাহাকে ব্যারিষ্টারের বোনের মতন সাজ সজ্জা দিতে হইবে, বড় একট বোর্ডিংএ রেখে পড়াতে হ'বে। নইলে তার সমাজে তাকে মাথা হেট্ করে চল্‌তে হবে। সে অনেক খরচ। বিলাত ফেরত সমাজে

একটা বোন পোষা মাসিক একশ টাকা খরচের কমে চলে না। ব্যারিষ্টার ভাইয়ের তা বহন করা বর্ত্তমানে শক্তির অতীত। বিশেষ মৃণালিনী শান্ত মেয়ে নয়, সেইত সেধে নিয়েছে এতগুলি দুর্ভাগ্য তার নিজের মাথায়! সে যে ব্যারিষ্টার ভাইএর গৃহিনীর সঙ্গে মিল রাখিয়া চলিতে পারিবে এমন বিশ্বাস হয় না।

ছোট ভাই ছোট চাকরী করেন। হিন্দু সমাজেই চলাফেরা করেন। এতবড় একটা বোন অবিবাহিত রেখে পোষা তার নেহাৎ বিড়ম্বনারই কারণ হইবে। মৃণালিনী ডাকাতের হাতে পড়েছিল, তাও লোকে শুনবে। তাঁর গৃহিনী খুব বড় হিন্দুর ঘরের মেয়ে, মৃণালিনীর সংস্পর্শ তিনি প্রাণে প্রাণে পছন্দই করেন না! ভবিষ্যতে একটা বিশেষ বাড়াবাড়িই হবে।

তাই ত, কি করা যায় মৃণালিনীর উপায়? বলদেব জ্যাঠা বুঝিয়া শুনিয়া নিরুত্তরই রহিলেন। তাঁহার মনেও একটা তর্কের তরঙ্গ উঠিতেছিল! হতভাগ্য বিনয় রায় এ কি করে গেছে, তার সংসারটাকে! লেখাপড়া শিখেছিল সে অনেক, অর্থ উপার্জ্জনও করেছিল অনেক; কিন্তু ছেলেমেয়েগুলিকে এমন করে ভাসিয়ে দিয়ে গেছে এই পতনের বানের মুখে! সে যে তার ভাণ্ডার ফুরিয়ে দিয়েছিল, সন্তানদিগকে বিদ্যা কিনিয়া দিতে! ষাট বছর বয়সেও তাকে উপার্জ্জনের জন্য রক্তক্ষয় করিতে হইয়াছে! তাই ত জীবনের একদিন বিশ্রাম না পেয়ে সংসারে সুখের আনন্দ কিছুমাত্র গ্রহণ না করে, ষাটের পারে যেতেই তার শেষ হয়ে গেল! বলদেব দেখিলেন,—এই ত বাংলায় বিদ্বান্ সমাজের হিসাব নিকাশের খতিয়ান!

ভাইএরা আর বিলম্ব ক'রে পারেন না। পল্লীর সমাজে তাদের কোনও প্রতিপত্তিই নাই। সুতরাং মায়ের শ্রাদ্ধটা তাঁরা গঙ্গাতীরে

বসিয়াই সারিবেন, ঠিক করিয়া, পল্লীমাটীর সহিত সম্বন্ধটা এই উপলক্ষে একেবারে ছিঁড়িয়ে ফেলিয়া সহরে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। এই বিষয়ে দুই ভাইই একমত।

দুই ভাই এক সঙ্গে অনুরোধ করিলেন বলদেবকে,—আপনি কিছুদিন মৃণালিনীর ভারটা গ্রহণ করুন। তারপর আমরা বিবেচনা করে দেখি। আমরা দুভাই ওর ভরণ-পোষণের ব্যয় দশ পাঁচ টাকা যা লাগে তাই দেব।

বলদেব হাসিয়া বলিলেন, “মায়ের ভার সন্তানেই বয়। মিণীকে আমি মা ডেকেছি, মায়ের মত পালন আমিই করব। তোমাদের কাউকে কিছু দিতে হবে না। কিন্তু একটা কিছু মিণীকে দিয়ে যাও। ঠাকুরদাদার আমলের এই ভাঙ্গা বাড়ীটা, আমবনের আড়ালে ত বাঘ ভালুকের বাসা হবে। এইটা দিয়ে যাও বোন্‌কে তোমাদের স্নেহের দান।”

দু’ভাই তাতেই সম্মত হইল!

ভাইএরা চলিয়া গেল, কিন্তু বলদেব গেলেন না। আরও পাঁচ দিন গেল, তবু গেলেন না। মিণী বুঝিল, তার কোনও গতি কর্‌তে পাচ্ছেন না বলেই, জ্যাঠামশাই এখানে আট্‌কে রয়েছেন। মিণী জানিত, জ্যাঠামশাইএর বড় সুখের সংসার, তাঁহার দুইটী পুত্র, দুইটী পুত্রবধূ, কয়েকটী পৌত্র পৌত্রী। তারা সকলেই থাকে এক সাথে এক বাড়ীতে। তাদের চাকরী নাই, চাষ আছে! জ্যাঠামশাইয়ের গোয়ালভরা গরু, গোলাভরা ধান, বাগান ভরা ফুল। তিনি যে গাঁয়ে বাস করেন, সে গাঁয়ে তিনি সবার বড় সম্মানী! এমন সুখের সংসার ছেড়ে বৃদ্ধ আটক রইলেন;—কুল-ছাড়া সৃষ্টি-ছাড়া, নেহাৎ পর একটা মেয়ের জন্য! ক্ষুদ্র সে মৃণালিনী,—অতি তুচ্ছ তার স্বার্থ

সুবিধা! তার জন্য এমন একজন শান্ত, অবসয়-প্রাপ্ত বানপ্রস্থীকে টেনে সংসারের ঝঞ্ঝাটে অনর্থক জড়িয়ে রাখা, সে নিজের পক্ষে নেহাৎ নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা বলেই মনে করিল। তাহার সুখ সুবিধা সে পদে পদে আপন পায়েই দলিয়া দিয়াছে! সেজন্য তার পিতামাতা ভ্রাতা কেহই দায়ী নয়, নিতান্ত মুখবলা জ্যাঠামশাই এ ব্যক্তির এত অকুলি বিকুলি কেন? কত মধুর বুকভরা স্নেহে তিনি মা ডাকেন! সে ডাক শুনতে মৃণালিনী কেঁদে ফেলে।

এমনি প্রখর নারী জীবন পেয়েছিল মৃণালিনী যে, সে এই উনিশ বছর বয়সেও বড় কাঁদাকটির মধ্য দিয়া কখনও যায় নাই। তার সুস্থ সবল দেহ, সত্য-সরল প্রাণ, কাঁদাকাটির এখানে কি আছে? এইটাই সে জানিত। পিতা পৃথিবী ত্যাগ করিলেন, একটু যা কাঁদিয়াছিল তা সাময়িক মাত্র! তারপর শেষ আশ্রয়স্থল মা'ও গেলেন, এখনও কি বদ্ধপাগল মেয়েটার কাঁদিবার কারণ হয় নাই! যথেষ্ট হইয়াছে! মৃণালিনী খাঁটি কাঁদিতে শিখিয়াছে সেদিন, যেদিন নিরাশ্রয় অবলার সর্ব্বস্বহারী দস্যু নলিনীরঞ্জন; তা'র উপর লক্ষিত বন্দুক সঙ্গীর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। যে দিন সে দেখিয়াছে, যে এসেছিল তার সর্ব্বনাশ করে প্রতিহিংসা নিতে, সেই আবার তার জীবন রক্ষা করে নিজের মরণ বরণ করে নিয়ে চলে গেল! না, মানুষ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা হিংস্র নয়! মানুষ পরের জন্য আপনাকে ছিঁড়ে ফেলতে পারে। এ শিক্ষা সেদিন পেয়ে সে এসেছে ডাকাতের কাছে! তাই মৃণালিনী তার মা মরার চেয়ে দুঃখে কাঁদিতেছে! হায়! হতভাগ্য যুবক নলিনী-রঞ্জন; তোমার পাহাড়ে বুকে এমন প্রীতিগঙ্গা লুকান আছে! তবে কেন এ হিংস্রবৃত্তিতে তোমার প্রবৃত্তি; তুমি কত লেখাপড়া শিখেছ, কত সুখের আশা ভরসা তোমার? অর্থের অভাবে কি তোমায় এতবড়

নরকে নামাইয়াছে। তুমি এতদিন বিবাহ কর নাই? বোধ হয়—না। নারীর প্রীতি পড়িলে নিশ্চয়ই তোমার এ পাষাণবৃত্তি গলিয়া যাইত! কিন্তু হয় ত, আমিই বা তোমার এ পথে আন্‌বার কারণ হয়েছি! অনর্থক খেয়ালের বসে, তোমাকে কতই অপমান করেছি। তার প্রতিশোধ নিতে তুমি এসেছিলে! এই পর্য্যন্ত থেমে গেলে কেন? আমায় ত কলিকাতার বাজারে গিয়ে বেশ্যার দুয়ারে বেচতে পারে। ওঃ। কি প্রাণান্ত পণ তোমার আমার জীবন রক্ষা কর্ত্তে। সহচরদের প্রাণ বধ কর্ত্তে তুমি দ্বিধা কর নাই, আপনার কারাগার বা তদধিক যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন বা প্রাণদণ্ড নিশ্চিত করে তুমি আমায় জীবন্ত ফেলে গিয়েছ। তবে কি তুমি ভালবেসেছ আমায়। ও হরি! সে কি; এর মধ্যেও ভালাসাবাসি? শিক্ষিত ভদ্রসন্তান এরা, কি রাক্ষসের ব্যবসা এরা পেতে নিয়েছে। নরহত্যা যেন এদের খেলা? নলিনী গিয়েছিল, বন্দুক হাতে পেয়ে তার সহচরদিগকে খুন কর্ত্তে; তার সহচরেরা সেই আক্রোশে সুযোগ পেলে তারে খুন কর্‌বে না? সেত আমাকে বাঁচিয়ে গেল, তাকে এখন বাঁচাবে কে?

শৈল মৃণালিনীর দুরবস্থার সংবাদ পেয়েছিল! মণি সংবাদ পত্র পড়িয়া শুনাইল, সেই গ্রামের রায়ের বাড়ী ডাকাতি হইয়াছে, ডাকাতেরা সমস্ত টাকা কড়ি ত নিয়াছে, তার সাথে একটী যুবতী মেয়েও চুরি করিয়া নিয়াছে! শৈল্ বলিল, দূর যা, এমন কি হয়?"

মণি হাসিয়া বলিল, "হয় না? যে জঙ্গলে তোমার বাবাদের বাড়ী? দিনে ডাকাতি হ'লেই বা কে রোধ করে?"

"ডাকাত বুঝি জঙ্গলে থাকে! কল্‌কাতার এই কোঠা বাড়ীর জঙ্গলেইত চোর ডাকাতের বাসা! এখনকার ছেলেগুলি সব ডাকাত।"

"যতগুলি ছেলে রাস্তায় ঘুর্‌তে দেখ, সবই কল্‌কতার ছেলে নয় ওরা আসে তোমাদের ঐ জঙ্গলের মধ্য থেকে! তারাই চোর, তারাই ডাকাত।"

"তারা এখানে এসেই ডাকাতি শেখে। শুনেছি, চাকরী কর্ত্তে আসে, চাকরী না পেলে ডাকাতি করে। তা হোক, রায় বাড়ীর সে যুবতী মেয়েটা যে আমার সই।"

"তবেই তোমার সই ডাকাত-সই হয়ে গেছে। তুমি আর কখনও যেতে পাবে না সে ডাকাতের দেশে।"

"আমি আজই যাব। মৃণালিনী দিদির এই বিপদ, আমি যাব না? তবে দিদিও আমার ডাকাত কম নয়, তাকে ডাকাতে পাওয়া বড় সহজ নয়। তুমি সাথে চল, আজই যেতে হবে।"

"না, আজ হবে না, আজ আমি থিয়েটার দেখ্‌তে যাব। বাবা বলেছেন, তোমাকেও নিয়ে যেতে।"

"মৃণালিনীর এত বড় বিপদ, আমি যাব থিয়েটার দেখ্‌তে।"

শৈল কাঁদিয়া ফেলিল, "মণি! আমার অতি মাথায় কিরে, আমায় একটীবার দেখিয়ে আন মৃণালিনীকে!"

"তাকে যদি ডাকাতে ধরে নিয়ে থাকে, তবে তাকে তুমি দেখ্‌বে কি করে।"

"না, তুমি যাবে বল।"

"কি জ্বালা? আমি না যাই, দরোয়ান সাথে যাবে। আমার পাড়াগাঁয় যেতে ভয় করে।"

"না, তুমিই চল।"

"আমাকে দিয়ে কি হবে তোমার?"

"আমি মিণীকে বলে এসেছিলাম আমার মণিকে তোমায় দেখাব।"

"এত মন্দ সাধ নয়।"

"মনের মত বস্তু পেলে আপন জনকে দেখাতে হয় না? মিণী দিদি দেখ্‌বে, আমার মণি কত সুন্দর! যাবে বল।"

মণির চকে জল আসিল। বলিল 'যাব।' শৈল গেল স্বামীর অনুমতি আনিতে। মণির চোক দিয়া ধারা বহিল, আহা! কি মধুময় প্রাণ আমার মায়ের, বড় ভাল বাসেন তিনি আমায়! আমি যেন তার বড় গৌরবের সন্তান। "আমার মণি" কথাটী বল্‌লে তাঁর চোক দুটী স্নেহের আবেশে মুদে আসে। কিন্তু এই যে কি লজ্জা তাঁর, মা ডাক্‌লে ডাক্ শুন্‌তে পারেন না, মুখ ফিরিয়ে সরে যান। মণির মনে মাঝে মাঝে এটাও উঠিত, তাহার পিতার এ বয়সে এমন বালিকার পাণিগ্রহণ করাটা নিতান্ত নিষ্ঠুরতার কার্য্যই হইয়াছে। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে হবে. তবে মা আমার সাধ্বী সতী করুণাময়ী, তাঁকে অবহেলা বা অভিশাপ কখনও করিবেম না।

স্বামীর অনুমতি পাইতে শৈলের বিশেষ কষ্ট হইল না। তিনি বেশী বয়সে দ্বিতীয় পক্ষ করিলেও, সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। অধিকন্তু শৈলের সেবা যত্নে তিনি বড়ই অনুগত। এমন অনুগত সকলেই হয়। শৈল কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বলিয়া স্বামীর উপর কোনওরূপ জবরদস্তি করে না। বরং তাঁহাকে বিশেষ সমীহ করিয়াই চলে।—যেমন গুরুর কাছে শিষ্য, বাপের কাছে কন্যা, মুনিবের কাছে ভৃত্য। স্বামী তাহাকে যতই সরল সাহসিনী পত্নী ভাবে আনিতে উৎসাহিত করুন না কেন, শৈল তেমনটা পারিয়া উঠে না। স্বামী বলেন, পাড়াগেঁয়ে মেয়ের ঐত দোষ। শৈল মনে মনে বলে, বুঝ্‌তে পার্‌তে যদি ত্রিশ বছর বয়সের তফাতে তুমি না পড়্‌তে।

শৈল আসিল মিণীকে দেখিতে। আসিয়াই শুনিল, মিণীর মাও মারা গিয়াছেন। শৈল ছুটিয়া গিয়া, মিণীকে জড়াইয়া ধরিয়া, তার কাঁধের উপর মুখ রাখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কত কাঁদিল। মিণীও কাঁদিল। সে এখন কাঁদিতে শিখিয়াছে। শোকের প্রথম বেগ প্রশমিত হইলে দুইজনে গিয়ে একটা আমগাছের তলে বসিল। শৈল বলিল, "এখন কি কর্‌বে দিদি?"

"কি কর্‌বো, তাইত। একবার ভাবি—মরি।—কিন্তু তাই বা এখন পারি কই?"

"ছি! মরবার ইচ্ছা কর্ত্তে নাই।"

"যা কর্ত্তে নাই, তা অনেক করেছি। তোর কি মরতে ইচ্ছা হয় না, এমন বুড়ো স্বামীর ঘর কর্ত্তে গিয়ে;"

"এমন আর হয় না।"

„আমারও এখন মরতে সাধ হয় না। মণি পেয়ে তোর মরণের সাধ গিয়েছে। আমিও আমার মণি পেয়েছি!"

শৈল চকিত চক্ষে মৃণালিণীর পানে তাকাইয়া রহিল ! তার নিশ্বাস গুলি যেন জোরে পড়িতে লাগিল ! কথাটা যেন সে ঠিক ভাবে বুঝিতে পারিল না। মৃণালিনী আবার বলিল, "শোন্ শৈল, মনের কথা গোপন রাখ্‌লে আমি অস্থির হয়ে যাই। বলার লোক আমার কেউ নাই। তোকে যখন পেয়েছি, সবই তোকে বল্‌বো। আমি পুরুষ মানুষ ভালবেসে ফেলেছি ! আমার দর্প চূর্ণ হয়ে গেছে।"

"কে সে পুরুষ রত্ন ?"

"সেই—ডাকাতদের একজন ; যে আমার সর্ব্বস্ব নিয়ে আমার মাকে খুন করে গেছে।"

"সর্ব্বনাশ ! কে তা হ'লে তোর নারীধর্ম্ম হরণ করেছে ?"

"না, সে আমায় স্পর্শও করে নাই। একাকিনী গভীর অরণ্যে ফেলে চলে গিয়েছে। কিন্তু সে যদি যাবার বেলায় একটীবার, সেই মাঘের শীতে অন্ধকার রেতে, একটীবার আমার অধর স্পর্শ করে যেত, আমি সারাজীবন সেই চুম্বন রেখা সুধা দিয়ে এঁকে রাখ্‌তাম।"

"কি বলিস তুই ? পাগল হয়েছিস নাকি ?"

"যে যা' ছিল, তার থেকে উল্টে গেলেই পাগল হয়। আমি যা ছিলাম, তা আর নাই, একবারে উল্টে গিয়েছি। সেই ডাকাত আমারই হৃদয় সর্ব্বস্ব, তাকে না পেলে আমার নয়।"

"তাকে চিনিস্ তুই ?"

"চিনি না ? রাত্রিকালে, ছদ্মবেশ থেকেও তাকে চিনে নিয়েছি।"

"তুমি যে পুলিসের কাছে বলেছ, আমি কাউকে চিনি না !"

"যাকে ভাল বেসেছি, তাকে আপনি চিনিয়ে দিয়ে ফাঁসী দেব ? আমি মিথ্যা বল্‌তে শিখেছি। আগে ত জানি না, ভালবাসা, এমন সুরা, এতে নারী হৃদয় পাগল করে দেয়।"

"কি জানি, যেমন তোমার উৎকট হৃদয়, তেমনি বিকট প্রণয়। আমি কিছুই বুঝিলাম না।"

"বুঝ্‌লি না শৈল, সে আমার কত সুন্দর, সে পরকে বাঁচাতে আপনার মরণ মাথায় পেতে নিতে পারে। সে পাঁচ জন পুরুষ হত্যায় চেয়ে, একটা নারী হত্যাকে বড় করে ভাবে। সে আমার সাথে কত কাতরে যেচে গেছে, আমি যেন তার সহচরদের চিনিয়ে না দেই।"

"সে তোমায় ভালবাসে ?"

"নিশ্চয়ই ভালবাসে। নইলে তত কষ্ট করে আমায় সাথে নিয়ে যাবে কেন ? তাদের ডাকাতি ধর্ম্মের প্রধান সূত্র, নারী স্পর্শ কর্ত্তে নাই। আমাকে নেওয়া আসন্ন বিপদ জেনেও সে আমায় ডেকে নিয়েছিল তার সাথে। আমাকে বাঁচিয়ে রাখা, তাদের মরণের কারণ জেনেও সে তার বন্ধুর হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিয়েছিল ; কত ভালবাসে সে আমায়।

"বেশ, তাকে এখন ডেকে আন। এতে আর গোল কি ; তুমি যেমন ডাকাতে মেয়ে, সেও তেমনি ডাকাতে ছেলে।"

"তা কি কখনও হবে ; সেত আমায় আর দেখা দিতে পারে না। সে এসেছিল সর্ব্বস্ব লুটে নিয়ে আমার উপর প্রতি হিংসা নিতে। তা সে নিয়ে গেছে, আর আস্‌বে কেন ?"

"প্রতিহিংসা নিতে ? তুমি কি আগে তার হিংসা করেছ ?"

"অনেক করেছি ! আমিই বোধ হয় তাকে ডাকাত সাজিয়েছি।"

"বল কি ? তার নাম কি ?"

"ঐটা বল্‌তে পার্‌ব না। কারু কাছে নয় ! তা হলে সে ধরা পড়্‌বে। যাক, ও কথা ঐ পর্য্যন্ত। তুই এলি কার সাথে ?"

"মণি এসেছে সাথে। আমি তোমায় দেখাবার জন্যই মণিকে নিয়ে এসেছি। চল, দেখ্‌বে, সে কেমন অমূল্য মণি।"

"তোর মণি দেখ্‌বার আমার বড় সাধ নেই। আন্‌তে পার্‌লিনা বুড়োকে সাথে করে?"

"তুমি বড় বেয়াদব, আমার সামনে আমার স্বামীকে বুড়ো বলো।"

দুইজনে উঠিয়া শৈলদের বাড়ীর দিকে চলিল। শৈল ভাবনাগ্রস্ত, মৃণালিনী ভাবনা থেকে অনেকটা সুস্থ, সে মনের কথা অনেকটা বলিতে পারিয়াছে।

---

(১৪)

সেই দিনই কলিকাতা হইতে মৃণালিনী ও তাহার মায়ের নামে শমন লইয়া কলিকাতা পুলিশ কোর্ট হইতে পেয়াদা আসিল। এক দল ডাকাত ধরা পড়িয়াছে, তাহার একজনের কাছে তাহাদের বাড়ীর ডাকাতির মালের লিষ্টমত একটা ফটো পাওয়া গিয়াছে। তাদিগকে এবিষয়ে সাক্ষ্য দিতে হইবে। মৃণালিনীর মাতাত এক্ষণে জগতের সাক্ষ্যের অতীত, মৃণালিনীকে সাক্ষ্য দিতে যাইতেই হইবে। নইলে রাজবিধি লঙ্ঘনের অপরাধ তার হইবে। অপরাধে তার ভয় নাই, তবে এ সাক্ষ্য দিতে যাইবার কৌতুহল মৃণালিনীর বড় বেশী হইল। নির্দ্ধারিত দিনে বলদেব মৃণালিনীকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় সাক্ষ্য দেওয়াইতে লইয়া গেলেন।

আসামীর কাঠগড়ায় শুষ্ক মুখে রুক্ষ চক্ষে দাঁড়াইয়া আসামীগণ—মৃণালিনী তার মধ্যে দু'চার জনকে চিনিল? কিন্তু কাউকে চিনি বলে সে সনাক্ত করিল না! আহা! কত কাতর নয়নে চেয়ে আছে তারা। ডাকাতিত অনেকেই করে, শাস্তি কয়জনার হয়ে থাকে? একখানি ফটো দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করা হইল, এই ফটো-খানি ডাকাতেরা লইয়া গিয়াছিল? মৃণালিনী তাহা দেখিতে মনোযোগ না দিয়াই বলিল "না"। "ভাল করিয়া দেখিয়া বলুন"। মৃণালিনী দেখিল, তাহারই দশ বছরের ফটো; কি সরল শান্ত চিন্তাহত সে ছবি। মৃণালিনী ভাবিল সেই আমি, আর এই আমি। একটু ভাবিয়াই বলিল, "না, এ ছবি আমার নয়।" আসামী নলিনীরঞ্জন তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল মৃণালিনীর উপরে। তাঁহার দৃষ্টি নত হইল, চক্ষু ভার হইয়া আসিল। যেন তাতে জল ছোটে। সরকারী উকীল মুখ বক্র করিয়া বসিলেন, একটু ভাবিয়া আবার বলিলেন, "তোমার নিজের ফটো নিজে চেন না?"

মৃণালিনীর রাগ হইল। লোকটার এত মরুব্বিআনা কেন? মুখ তুলিয়া বলিল, "এ একটা ছোট বালিকার ফটো, আমায় চিহ্ন এতে কি আছে?"

"এত তোমারই বালিকা বয়সের ফটো।"

"ছোট বেলার ফটো; বড় হয়ে কেউ চেনে না।"

"ভাল করিয়া দেখ।"

"ডাকাত যে তার এই ডাকাতি করা সামান্য একখানা ছবি যত্ন করে কাছে রেখে, ধরা পড়ার সুবিধা করে রাখবে, এমন নির্ব্বোধ ডাকাত কেউ থাকে বলেত আমার বিশ্বাস হয় না! এ আমার ফটো নয়, এ ডাকাতের কোনও প্রিয়জনের ফটো হবে।"

মৃণালিনীর মুখরতা দেখিয়া এজলাজ সমেত লোক তার পানে চাহিয়া পড়িল। নলিনীরঞ্জন বসিয়া পড়িল।

মৃণালিনীকে তারা, যেতে বলিল। মৃণালিনী দূরে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইল। বলদেব বলিলেন "চল মা!" মৃণালিনী বলিল, "একটু দাঁড়াই জ্যাঠামশাই। যখন এজলাসে আস্‌তে হয়েছে, তখন আর দু'দণ্ড এখানে দাঁড়াতে বাধা কি? দেখে আসি না বিচারটা।" আসামী পক্ষের উকিলরা তখন বাদ বিচার আরম্ভ করিলেন। সকল আসামীরই উকিল ছিলেন, নলিনীরঞ্জনের কেহ উকিল ছিলেন না। বিচারক বলিলেন "তোমার পক্ষে কেহ উকিল নাই?" নলিনী বলিল, "না।"

"তামার বাপ ভাই আছেন, তারা উকিল দেন নাই?"

"ডাকাত ছেলের জন্য উকিল ভদ্রলোক দেয় না।" আসামীর চক্ষু ছল ছল করিতেছিল। বিচারকের তাহা দেখিয়া বুঝি দয়া হইল। "তুমি যদি উকিল চাও ত, আমি সরকার থেকে তোমায় একজন উকিল নিয়োগ করে দিতে পারি।"

"না, উকিল আমি চাই না।"

সরকারী উকিল বলিলেন, "ভদ্রলোকের ছেলে, ডাকাতি করেছে, এখন অনুতাপ হয়েছে, শাস্তি চায়, মুক্তি চায় না। তবে কথাগুলি ঠিক ঠিক বলে ফেল, সাজা কমই হবে।"

আসামী কোনও কথাই বলিল না।

গাড়ীতে উঠিয়াই মৃণালিনী বলিল, "এরাত সব ভদ্রলোকের ছেলে, এমন ভাবে ডাকাতি করে জ্যাঠামশাই?"

বলদেব বলিলেন. শুধু ভদ্রলোকের ছেলে নয়। এরা লেখা পড়াও বেশ শিখেছে। এর মধ্যে এল, এ, বি, এ, আছে।

"তবে ডাকাতি করে কেন ?"

"এদের বিদ্যাই এদের ডাকাতি কর্ত্তে শিখিয়েছে। এরা লেখা পড়া শিখেছিল টাকার জন্য। লেখাপড়া শিখে এদের টাকার গরজ আরও বেড়ে গিয়েছে। যারা লেখাপড়া শিখিয়েছে; তারা টাকা দেয় না! যদি বা কিছু দেয়, তাতে এদের পেট পোষে না। কাজেই ডাকাতি ধরেছে।"

"কত বড় শাস্তি হবে এদের ?"

"৮।১০ বছর জেল বা দ্বীপান্তর ! যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরও হ'তে পারে।"

মৃণালিনী শিহরিয়া উঠিল।

বলদেব একটু ভাবিয়া বলিলেন, "এর একটা ছেলেকে যেন আমি চিনেছি বলে বোধ হয়।"

মৃণালিনী কথা বলিল না।

বলদেব তথাপি বলিলেন, "এ ছেলেটা সেই নয়। যার সাথে তোমার বাবা তোমার বিয়ে ঠিক করেছিলেন। সেই তোমাদের বাড়ীতে এসেছিল, তোমায় দেখ্‌তে! তুমি ভেঙ্গে দিয়েছিলে সেই সম্বন্ধটা, ভালই করেছিলে। কিন্তু বিয়ে হলে বোধ হয় ছেলেটা এমন ডাকাত হতো না"

মৃণালিনী লজ্জায় মুখ ফিরাইল! কিন্তু বলিল, "তবে এর এই ডাকাতির জন্য আমিই দায়ী।"

"ঘটনাচক্র। বিধাতার ইচ্ছা। তুমি নিমিত্ত মাত্র। এখানেও সেই ভগবদ্‌বাণী, "নিমিত্ত মাত্র ভব সব্যসাচী।" তুমিও কি চিন্‌তে পেরেছ মা ?"

মৃণালিনী কথা বলিল না, একবারে ফিরিয়া বসিল। চকের ধারা

গণ্ড বহিয়া গেল। মুছিতে হাত তুলিতে সাহস হইল না। যদি বৃদ্ধ বুঝিয়া ফেলেন। বৃদ্ধের বড় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি।

একটু পরে বলদেব বলিলেন "তুমিও চিনেছ মা। তাই ফটে চিনতে পার নাই বলে, মিথ্যা বলেছ। মায়ের প্রাণ তোমায়, সহানুভূতিত জাগ্‌বেই।"

মৃমালিনী একটা বিষম খাইল, মনে মনে বলিল, "দূর পোড়ারমুখো বুড়ো। তুমি কি বুঝ্‌বে, কি তরঙ্গের আঘাতে আমার বুক ভেঙ্গে গুড়ো হয়ে যাচ্ছে।" প্রকাশ্যে বলিল, "লোকটার বাপ ভাই ওর জন্য কিছুই কচ্ছে না?"

"কি আর করবে? কর্‌বার কিছুই নাই। ওরই কাছে রিভল-ভার পাওয়া গেছে।

মৃণালিনী গাড়ার দোর খুলিয়া রাস্তার উপর মুখ রাখিয়াই চলিল।

---

(১৫)

মৃণালিনীও বলদেব মৃণালিনীর ছোট দাদার বাসা বাড়ীতেইত দুদিন ছিলেন। বড় দাদা বিলাত ফেরত ব্যারিষ্টার, সেখানে যাইতে বলদেবের ইচ্ছা হইল না।

দুদিন পরে বলদেব বলিলেন, "চল মিণী মা, আমরা যাই।"

মিণী বলিল, "আমি যাব না জ্যাঠামশাই আপনি যান।"

"সেকি? তুমি কোথায় থাক্‌বে?"

"এই খানে, ছোড় দাদার বাড়ীতে।"

"তিনি তোমায় রাখ্‌তে চেয়েছেন ?"

"ভায়ের বাড়ীতে বোন্‌ থাকবে, তার আর অনুমতি জিজ্ঞাসা কি ?"

"না মা, এখনকার ভাই বোন্‌ তেমন সম্বন্ধ রাখ্‌তে পারে না। তোমার এখানে থেকে কাজ নাই।"

"দাদার বাসায় ঝি চাকর ত থাকে, আমি রান্না বান্না গৃহকর্ম্ম করতেত জানি জ্যাঠা মশাই।"

"মৃণালিনী ! তোর জ্যাঠামশাইএর ষাট বছর পার হয়ে গেছে, আমি অত মূর্খ নই। তোমার মনের ভাব বুঝ্‌তে পেরেছি। তুমি ভাবছ, আর যখন কেউ নাই তোমাব, তুমি ভাইয়ের বাড়ী দাসী হয়ে থাক্‌বে। কিন্তু আমি যে তোকে মা বলেছি, আমি কি তোমার একটা ব্যবস্থা করবো না ?"

"কি কর্‌তে পারেন আপনি আমার ?"

"মৃণালিনী ! আমি যে তোমার বিবাহ দেবার জন্য সৎ পাত্র স্থির করেছি।"

"আমার বিবাহ ?" মৃণালিনীর চক্ষু ছল ছল করে উঠিল। "না জ্যাঠামশাই, তা আর হয় না।" ধারা গড়াইয়া গণ্ড বাহিয়া বক্ষ বসন ভিজাইয়া দিল। বলদেবেরও কান্না আসিল। বলিলেন, "কেন হবে না মা ? শিবের মতন বরে আমি তোমায় সমর্পণ করবো। সে অন্নের সংসারে তুমি অন্নপূর্ণা হবে। দুঃখ করো না, ভাগ্যের বিপর্য্যয় লোকের এমনি ঘটে থাকে। এ দুঃখ তোমার থাক্‌বে না।"

"বিশ বছরের মেয়ে, যাকে ডাকাতে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল, সে কি যেতে পারে কোনও সৎপাত্রের কুল কলঙ্কিত করতে ?"

"না না, আমি জানি, তুই মা আমার অন্তরে বাহিরে পবিত্র।"

"আপনি জানেন, স্নেহের অন্তরে। জ্যাঠামশাই, রামচন্দ্রও রাখ্‌তে পারেন নাই সীতাকে ; বনে দিতে হয়েছিল।"

"ছি ! ছি ! এখনও তোর দুরন্তপনা।"

বলদেব যে ধমক দিলেন, তাতে ক্রোধের চেয়ে স্নেহ অনেক বেশী ছিল। মৃণালিনী খানিকক্ষণ মাথা নিচু করিয়া বসিয়া ভাবিল, তখন বলদেবও বসিয়া ভাবিলেন, বালিকার দোষ কি ? এতগুলি আকস্মিক আঘাতে তার চিত্তবৃত্তি ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া গিয়াছে। সংসার সুখে তার আর তৃষ্ণা নাই। কিন্তু এই প্রখর বুদ্ধি, পবিত্র তেজস্বিতা যদি পবিত্র গৃহধর্ম্মের ভিতব দিয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে, তবে কত সুখের হইবে সে সংসার। বলদেবের বড় আশা, মৃণালিনীর নারীত্বের পূর্ণ বিকাশ তিনি দেখিবেনই। মৃণালিনী আর কোনও কথা বলিল না দেখিয়া তিনি বলিলেন, "তবে আমি যাত্রার আয়োজন করি। তুমি তোনার ভাই ভাই বউকে ব'লে ঠিক হয়ে এসো।"

মৃণালিনী একটু সরিয়া দাড়াইয়া বলিল, "জ্যাঠামশাই ? আপনার বড় ভুল হয়েছে।"

"কি ?"

"আপনার রাক্ষসী মেয়ে কায়মনে পবিত্র নয় !"

"বলিস্ কি ?" বলদেব কিছু বিমনা হইলেন।

"মেয়ে মানুষ মাটীর হাড়ি। একবার ছুতেই মার যায়। আপনি যান, আমি যাব না। জ্যাঠামশাই, উকিলে কি আসামী খালাস করে আন্‌তে পারে ?"

এ কি ? পাগলী মেয়েটা এমন এলো মেলো কথা বলে কেন ? বলদেব একটু ভেবে দেখ্‌লেন। তারপর বলিলেন, "যাবে না তুমি ?"

"না।"

মৃণালিনীর দৃষ্টি ও বচন ভঙ্গিমা স্থির সঙ্কল্পেরই সূচনা করিল! বলদেব যেন সহসা কি একটা স্পষ্ট আলো দেখিতে পাইলেন। তিনি বলিলেন "উকিলের কথা কি জিজ্ঞাসিতেছিলে? তুমি কি উকিল দিয়ে নলিনী ডাকাতকে খালাস করে আন্‌তে চাও?"

"তা কি পারা যায়?" মৃণালিনী একথাটী খুব ছোট করিয়াই বলিল।

"এতে এত বড় আগ্রহ!" বলদেব বিস্ময়ের দৃষ্টিতে মিণীর মুখ নিরীক্ষণ করিলেন।

"ক্ষতি কি জ্যাঠামশাই? পাপীকে কি ক্ষমা করতে নাই?"

"পাপীকে যে প্রেম করে, সে মহাপ্রাণ। আমি যাই মা। পাপ পুণ্য জানিনা, তুমি নরকে ডুবলেও আমি তোমার জ্যাঠামশাই।"

বলদেব আর ফিরিয়া না চাহিয়াই প্রস্থান করিলেন। মৃণালিনী সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। কতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিল, তা সে বুঝিতে পারে নাই—অনেকক্ষণ। বউদিদি এসে বলিল, "ঝিটা যে আজ এলো না মিনু?"

মৃণালিনী চমক খেয়ে, চোক মুখ মুছে বলিল, "ঝি আর আস্‌বে না, আমি বলে দিয়েছি।"

"সে কি? কেন?"

"বড় নোংরা।"

"তবে একটী অপ্সরী ঝি কোথায় পাওয়া যাবে?"

"তুমি অপ্সরী বিদ্যাধরী দেখেছ বউদিদি?"

"না আমরা দেখিওনি, চাইও না।"

"তবে আমাকেই ভেবে নেও না একটা অপসরী।"

"আছে। আছে লো তোর রূপ! কেবল তোলা ছবি, কারু কোনও কাজে আসলো না।"

"আগে তোমারই কিছু কাজে আসুক।"

মৃণালিনী ব্যস্ত হয়ে কাজে মন দিল। ঘর ঝাট দিল, বাসন মাজিল, উনুনে আঁচ দিল। কলের জল ধরিয়া রান্না চড়াইল! সংসারের ষোল আনা কাজ মৃণালিনী আপনি সারা করে দিল।

মৃণালিনীর দাদা যে বাড়ীতে থাকেন, সে একটা বড় পুরাতন বাড়ী। তাতে এমন অনেকগুলি পরিবার বাস করে। কোনও ঘরে এক উকিল বাবু, কোনও ঘরে ডাক্তার, কোনও ঘরে দোকানদার, দালাল, নীচের ঘরগুলিতেও ট্রামের চালক, ফেরিওয়ালা, চা-ওয়ালা কাপড় ধোলাইওয়ালা, চুল-ছাটাওয়ালা প্রভৃতি বহু ভদ্রলোক সপরিবারে সেই এক বাড়ীতেই বাস করেন। সে একটা ছোট খাটো গ্রাম। আটটার সময়ে যখন সকল ঘরের চুলোয় ধুঁয়া উঠিয়া কুণ্ডলি পাকাইয়া পাকাইয়া ঘরগুলির মধ্য হইতে পালাইবার ফাঁক পায় না, তখন হাঁচি কাসিতে বাড়ীটা কোলাহলময় হইয়া উঠে! দশ এগারটার পর আর সে বাড়ীতে পুরুষ মানুষ কেউ থাকে না। তখন মেয়েরা পাঁচ ছ'জন এক ঘরে বসে তাস খেলে, নভেল পড়ে। যার ছেলের ব্যাম, সে ছেলের বাপ পিতামহের উপর গালি পাড়ে।

মৃণালিনীর একদিনের মধ্যে আলাপ পরিচয় হইয়াছে অনেকের সাথে। তাদের পাশের ঘরে এক উকিল বাবু বাস করেন। মৃণালিনী সকলকে খাওয়াইয়া, আপনার ভাত ঢাকিয়া রাখিয়া, উকিল গৃহিণীর কাছে গিয়া বসিল। উকিল গৃহিণী তখন একটা ছেঁড়া সেমিজ সেলাই করিতেছিলেন, যেন খুব সন্তর্পণে চুপে চুপে, কেউ না দেখে। এযুগে

আপন দারিদ্র্য ঢেকে রাখা মনুষ্য জীবনের একটা বড় কাজ। সহসা এই নিতান্ত নূতন একটা মেয়ে সেখানে উপস্থিত হইল দেখিয়া উকিল গৃহিণী খুসী হইলেন না, মৃণালিনী বড় কাতরে, তার স্বভাব কোমল মধুর কণ্ঠে বলিল, "মা! বড় দায়ে পড়ে এসেছি আপনার কাছে!"

উকিল জায়ার রোষ তীব্র দৃষ্টি কোমলে নামিল! এমন সুন্দরী এতবড় মেয়েটা এত কাতরে ডাকিল মা! বড় ভাল লাগিল, উকিল গৃহিণী রূপে ছিলেন বড় খাটো, বয়সে ও দেহের গঠন দেখে যেমন বোঝা যায় মৃণালিনীর চেয়ে একটু খাটো। তার কাছে এত ছোট হয়ে রূপবতী যুবতী ডাকিল মা, উকিল জায়ার এতে একটু চিত্ত প্রসাদ লাভ হইল। পরকে ছোট হতে দেখ্‌লেই, আপনি বড়, এই অনুভূতিটা জেগে ওঠে, আর পরকে বড় হয়ে জাহির হ'তে দেখ্‌লেই আপনাকে বুঝি ছোট করে গেল, এই আশঙ্কায় একটা জ্বলুনি বাহির হইয়া আইসে। এই নিয়েই মানুষের নাম অভিমানের ওজন। উকিল গৃহিণী শান্ত স্বরেই বলিলেন, "কি চান্ আপনি?"

"আমি একটা আংটী বিক্রয় করবো; আমার বড় দায়।" বলিয়া মৃণালিনী আঁচলের গাঁট খুলিয়া একটী চক্‌চকে হীরা বসান আংটী বাহির করিয়া দিল। যাঁকে দিল, তিনি হীরা চেনেন না, বলিলেন, "এর কত দাম।"

"বাবা আমার দেড়শ টাকার কিনে দিয়েছিলেন, এখন আমি একশ টাকা বা তার কিছু কম হলেও বেচি, আমার বড় দায়।"

উকিল গৃহিণী মুখ আঁধার করিলেন। বলিলেন, "না, অত দাম দিয়ে আমরা পুরাণ জিনিষ কিন্‌বো না!" "কিন্‌তে পারি না," তা বল্লেন না।

মৃণালিনী বলিল, “এর জন্য আমি নগদ টাকা এখনই চাই না। আপনি একটা বড় উপকার আমায় কর্ত্তে পারেন।”

“কিরূপ ?”

“আপনার স্বামীত উকিল ?”

“হ্যাঁ।”

“একজন ভদ্রলোকের ছেলে ডাকাতি মোকদ্দমায় পড়েছেন। তিনি যদি তার পক্ষে উকিল হয়ে মোকদ্দমা চালান, তবে তাঁর সেই ফিটাই আমি আংটীর মূল্য ধরে নিতে পারি। আমার আর কিছু নাই, এই আংটী মাত্র আছে।”

“তা হ'তে পারে! উনি উকিল খুব ভাল, তাঁকে আমি বল্‌বো। সে ডাকাত লোকটা তোমার আত্মীয় বুঝি।”

“হ্যাঁ!”

“তা এর জন্য তুমি এসেছ কেন? তোমার ভাইত আস্‌তে পার্ত্তেন, তাঁর সঙ্গে ওঁরত খুব ভাবই আছে।”

“আমার আত্মীয়, ভাইএরত আত্মীয় নয়। দেখুন, আর একটা অনুরোধ, এ কথাটা আমার ভাই বা আর কেউ যাতে জান্‌তে না পারে, তা আপনাকে কর্ত্তে হবে।”

“ও, তোমার সঙ্গে গোপনে পরিচয়, সে ডাকাতের সাথে?” উকিল গৃহিণী ঘৃণার হাসি হাসিলেন।

মৃণালিনীও হাসিল, বলিল, “সেইরূপ কিছু আছে, আপনাকে লুকাব না। কিন্তু আপনার স্বামী যেন এ সব বুঝ্‌তে না পারেন।”

“এ আংটীটা ডাকাতি করা আংটী নয় ত?”

“ডাকাতি করা আংটী উকিলের বাড়ীতে কেউ নিয়ে আসে?

এটা আমার বাবা আমার বিয়ের জামাইকে যৌতুক দেবেন বলে গড়িয়েছিলেন।”

“তোমার বিয়ে হয় নাই?”

“তা হয়েছে বই কি? বয়সত দেখ্‌ছেন আপনার বড় বই ছোট হব না।”

“স্বামীর ঘর বুঝি মোটেই কর না।”

“এখনও করি নাই, তবে একবারে যে করবো না, এমন সঙ্কল্প নাই।”

“দেড়শ টাকার আংটী যার হাতে, তার গায় কি দু’খানা গয়নাও থাকে না?” উকিলের গৃহিণী কি না? জেরা কর্‌তে শেখা আছে।

“তা কিছু ছিল, ডাকাতে নিয়ে গেছে।”

“সে কি, ডাকাত যার প্রাণের বন্ধু, তার উপর আবার ডাকাতি?”

“যে ডাকাত, সে কি বন্ধুত্বের খাতির করে?”

“তারই জন্য আবার আংটী বেচা?”

“তা দেখুন, এই উকীল বাবু যদি আপনার পাঁচখানা গয়না বেচে বা বাঁধা দিয়ে খরচ চালান, তার পরে তিনি যদি কোনও রোগে পড়েন, তবে বাকি দু’একখানা যা থাকে, তা দিয়ে তার চিকিৎসা করেন না?”

সহসা একটা খোঁচা খেলে, মানুষ যেমন উঃ করে সাড়া দেয়, উকিল গৃহিণী মনে মনে খুব খোঁচাটাই খাইয়া জ্বালা বোধ করিলেন কোনও কথা বলিনেন না, মনে মনে বুঝিলেন, “কুলটা মেয়ে মানুষ, কথা কইতে জানে খুব।“

মৃণালিনী আসামীর নাম লিখিয়া আংটী ও কাগজ রাখিয়া আসিল। বিশেষ সাবধান করিয়া দিয়া আসিল। আসামীও যেন জানিতে না পারে, উকিল নিয়োগ কে করিল? আস্‌বার সময় উকিল গৃহিণীর সেই অর্দ্ধ মেরামতী সেমিজটী হাতে লইয়া বলিল, “এটা

আমায় দিন, আমি ভাল করে মেরামত করে দেব, এ সব কাজ আমি ভালই জানি।”

১৬

উকিল গৃহিণী আগে স্বামীকে আংটীটী দেখাইলেন। স্বামী বলিলেন, “এ যে খুব মূল্যবান অঙ্গুরী, কোথায় পেলে ?”

তারপর বিস্তারিত বিবরণ করিলেন। একটা কুলটা মেয়ে এখানে এসেছে। একটা ডাকাতের সাথে তার গুপ্ত প্রণয় আছে। সে ডাকাত ধরা প’ড়ে, এখন জেলে আট্‌কা। তার সাথে মাগীটার ভাব এমনি জমাট বেঁধে গেছে যে, সে এই তার যথাসর্ব্বস্ব বেচে তার প্রেমের পুরুষকে খালাস করে আন্‌তে চায়! এই আংটী দিয়ে গেছে, তুমি একটু চেষ্টা কর। এই যে কাগজে লিখে দিয়ে গেছে সে নাম,—মাগী আবার ইংরাজীতে লিখে দিয়েছে,—দেখ নামটা পড়ে।

উকিল বাবু নাম পড়িলেন। সর্ব্বনাশ! এ আসামী কখনও খালাস হয়? এত আমার জানা মোকদ্দমা, এই আসামীর কাছেই রিভলবার বন্দুক পাওয়া গেছে। এর যে যাবজ্জীবন হবে। আর এ আংটী, নিশ্চয়ই এটা তার ডাকাতির মাল! এটা রেখে কি বিপদে পড়্‌তে হয়?

“তবে এটা তারে ফিরিয়ে দেই ?”

“না না থাক, দেখি। আগে রিপোর্টটা দেখে আসি, ডাকাতি মালের লিষ্টির মধ্যে কোনও হীরার অঙ্গুরীর উল্লেখ আছে কিনা। মাগীটা খুব সুন্দরী বুঝি।”

"হ্যা। ছাই সুন্দরী। রংটা ফরসা বটে। চোখ দুটো, এতবড় বড়—যেন রাক্ষসের মত। অত ফরসা রং কি বাঙ্গালীর ভাল দেখায়? মুখখানা গোলপানা,—যেন তলো হাড়ি। মাগীটা কি হাতে পদে পাহাড়। যেন গোরা পল্টন। বলে, ঐ পাশের বাড়ীর বাবুর বোন। বোনের মতন ত কিছুই দেখি না। দাসীগিরি করে, তাই দুটী খেতে পায়। তা হবেই ত, অমন কুলছাড়া ডাকিনী-বোনকে কি ভাই আদর করে।

"তুমি তাকে একবার ডেকে এনো ত আমার কাছে। বলো—তার কাছে অনেক কথা জান্‌বার আছে, নইলে মোকদ্দমা মুভ্‌ করা চলে না।"

"সে সন্ধ্যাবেলা, তুমি বেড়াতে গেলে আস্‌বে বলেছে,—এসে শুনে যাবে, তুমি কি বলো।"

"আচ্ছা। আমি আজ বেড়াতে যাব না।"

উকিল গিন্নীর যেমন রূপ, তেমনি বুদ্ধি!

সন্ধ্যার পরেই মৃণালিনী আসিল-উকিলের ঘরে। ঘরে উকিল বাবু বসে আছেন দেখে সরে যাচ্ছিল। উকীলজায়া ডেকে ফিরালেন। "ওগো যাচ্ছ কেন? ওনি যে তোমায় দেখতে চেয়েছেন। তোমার সাথে কি কথা আছে।"

মৃণালিনী মাথায় কাপড়টা টানিয়া দিয়া দাঁড়াইল। উকিল জায়া একটু ছোট করে বল্লেন, "লজ্জার ঘটা দেখ, অমনি ঘোমটায়ই ত খেমটা নাচে।" উকিল বাবু সেইদিকে চেয়ে বল্লেন, "দেখ তোমার মামলার ব্যাপার আমি সব জানি। বড় জটিল মামলা। আমি সাধ্যমত চেষ্টা করবো, অন্ততঃ তোমার অনুরোধে যাতটা পারি। তবে আসামীর সাথে একবার সাক্ষাৎ করবার দরকার।"

মৃণালিনী ছোট করিয়া কথা বলিল, "আপনারা উকিল, আসামীর সঙ্গে জেলে গিয়েও দেখা কর্ত্তে পারেন।"

"হ্যাঁ। তা ত পারিই। আসামী হয়ত আমাকে চিন্‌বে না। হয় ত সি, আই, ডির গুপ্তচর ভেবে আমার কাছে কোনও কথাই বল্‌বে না। তুমি আমার সাথে গিয়ে, তাকে চিনিয়ে দিয়ে আস্‌বে।"

"মৃণালিনী হতাশ কণ্ঠেই বলিল, তবে থাক্‌, আপনি আর কষ্ট কর্‌বেন না।"

"না না, এতে হতাশ হবার কিছুই নাই। মোকদ্দমায় খুব সুবিধা আছে। আচ্ছা কাল আমি আসামীর সঙ্গে দেখা কর্‌বো। পরে দয়কার হয় ত, তুমি যেও।"

মৃণালিনী দরজার বাহিরে গেল। উকিল বাবু আবার ডাক্‌লেন, "ওগো শোন, শোন!" মৃণালিনী আবার ভিতরে আসিল। উকিল বাবু নিজের গৃহিণীকেই বলিলেন, "ওগো ভদ্রলোক এসেছেন, বসিয়ে একটা পান টান দাও।"

মৃণালিনী বলিল, "আমার সঙ্গে আর কোন কথা আছে কি?"

"না, আজ আর বেশী কিছু নয়, কাল যা হয় বল্‌বো। বল্‌ছিলাম, তোমার আংটীটা তুমি নিয়ে যাও, তার পরে যাহা হয় করা যাবে।"

মৃণালিনী আর দাঁড়াইল না।

পরদিন বিকালে পাঁচটা বাজিতেই উকিল গিন্নি এসে মৃণালিনীকে ডাকিল। মৃণালিনী ঘরে পা দিবা মাত্রই উকিল বাবু বলিলেন, "এখনই যেতে হবে। আসামী তোমায় যেতে বলেছে। ট্যাক্সি এনেছি, এখনই ওঠ। এরপর জেলের ফটক বন্ধ হয়ে যাবে। চল।"

মৃণালিনী কিছু ভাবিবার অবসর পাইল না। কাহাকেও বলিয়া যাইবার বুদ্ধিও তার আসিল না। যে দেবতার মন্ত্র-মুগ্ধ

হইয়া বঙ্কিম চন্দ্রের মৃণালিনী রাজ দুহিতা, রাজান্তঃপুর-চারিণী আদরিণী হইয়াও. প্রিয়তমের সঙ্কেতাঙ্গুরীয় দর্শনে পলকের মধ্যে গৃহের বাহির হইয়াছিল, আমাদের এই দুঃখিনী স্বজনত্যক্তা মৃণালিনীও বুঝি সেই দেবতার মন্ত্রেই এমনভাবে গৃহের বাহির হইল। ফিরিয়া কোথায় দাড়াইবে তাহাও একবার ভাবিল না মৃণালিনী। সে যে ভাইএর ঘরে ভাত চড়িয়ে এসেছিল। ধিক তোমায় উদ্দাম যৌবন। কি প্রখর মায়া শক্তি তোমার। প্রেমের বীজ অস্ফুরিত করিতে তুমি বড় উর্ব্বর। এক পলকেই অঙ্কুর পত্র পুষ্প ফল পর্য্যন্ত ফুটিয়া উঠে। যৌবনে আর প্রেমে যদি সমাবেশ হয়, তবে সে স্রোতে বুঝি সহস্র ঐরাবত ভাসিয়া যায়. লক্ষ হিমাদ্রি ভেদ হয়, তাইত শ্যাম নাম শুনে রাধার কুল মান ভাসিয়া গিয়াছিল। এ যদি ভাবে ভোলা কবিজনের মিথ্যা কল্পনা হয়, এ আখ্যায়িকার লেখকও সেরূপ সংসার-জ্ঞানহীন-ব্যাকুব ভোলা কবি হইতে আপত্তি করিবে না।

ট্যাকসি হাকিল, তাহার চেয়ে অনেক দ্রত গতি বুঝি আরোহী দের মনোরথের। এদিকে উকিল গৃহিনী একবার উপরে থাকিয়া চাহিয়া দেখিলেন, তাহার স্বামীর ধারে পাশাপাশি বসিয়া মৃণালিনী। সত্যিইত মৃণালিনী বড় সুন্দরী. তাহার স্বামীও বড় সুন্দর, আজ আবার তিনি কি সুন্দর, নটবর বেশে সজ্জিত, কত সুগন্ধ মাখিয়া আসিয়াছেন আজ তিনি, সত্যো-ধোয়া আদ্দির জামাটি কি সুন্দর মানিয়েছে, ঐত সেই হীরার আংটীটা তাহার হাতে ঝল মল করিতেছে। কি বা বিনোদ হাসি তাঁহার মুখে আজ ফুটিয়াছে চোক ফুটী কেমন ভাসিয়া উঠিয়াছে। নিশ্চয়ই তিনি সুরাপান করিয়াছেন। তাইত তাহার ললাট কপোল এমন লাল হইয়া

উঠিয়াছে। আর মৃণালিনী—পথে পড়া কুল-ছাড়া মুখপোড়া অভাগী, কিন্তু সে যে বড় সুন্দরী, স্বামীত পুরুষ ভাল নয়। মৃণালিনী সত্যই বড় সুন্দরী। আহা! সাধ করিয়া এ সাপিনীকে আমি কেন আশ্রয় দিয়েছিলাম, আমি আপনার সর্ব্বনাশ আপনি করিয়াছি। পাপিষ্ঠা একটী বার ভাবিল না, একটী বার লোক লজ্জা ধর্ম্মভয় করিল না, যেমন ডাকা অমনি ঝাপিয়ে পড়া, হায়রে কি বুদ্ধিহীনা আমি, আমিইত ডাকিয়া আনিয়া ছিলাম,—এমন সর্ব্বনাশীকে আমার সর্ব্বনাশ করিতে; আমি কালো বেটে কুৎসিতা, তাইত বাবার এত টাকা লেগেছিল আমায় বর জোটাতে। বাবার আশীর্ব্বাদে পেয়েছিলাম, আপনার নির্ব্বুদ্ধিতায় হারালাম। সর্ব্বনাশিনী মিণা, আস্‌বিত আবার ফিরে। মারবো দশ ঘা ঝাটার বাড়ি তোর মুখে, যা থাকে আমার অদৃষ্টে। উকিল গৃহিনী সে দিন আর উনুনে হাঁড়ি চড়াইলেন না। ছেলেটা কাঁদিতেছিল, আর এক ঘর থেকে দুটো ফেন ভাত আনিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া বিছানা লইলেন। এখন তার বুক ভাঙ্গিয়া কান্না আসিল।

হায় অভাগিনী মৃণালিনী; নিতান্ত ধূমকেতুর মতন তুই নেমে এসেছিলি ধরাতলে। কত ঘর জ্বালালি, আরও কত জালাবি।

ট্যাক্‌সি আসিল একটী গলির মোড়ে। উকিল বাবু মৃণালিণীকে লইয়া গলির ভিতর ঢুকিলেন। তার পর একটী ছোট এক তালা বাড়ীর তালা খুলিয়া তার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাম, কি অন্ধকার। দুর্গন্ধে নাক জ্বলে যায়। এই কি জেল? হতে পারে, নইলে এমন কদর্য্যস্থান আর কোথায়? দুটো ঘর অতিক্রম করিয়া তাহারা আর একটী ঘরে গেল। সেখানে গিয়ে বাবু বাতি জালিল।

ঘরটা কতকটা পরিস্কার। একখানা খাটিয়ার উপর অর্দ্ধ মলিন; বিছানা বিছান। একটী জানালায় পাশ দিয়ে একটু বাতাস খেলিতেছে। বাবু খাটিয়ার পরে বসিয়া মৃণালিনীকে বলিলেন "বোস।"

মৃণালিনী বসিল না। তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল, "এ আবার কোথায় আন্‌লেন? এই কি জেল?"

"জেল কি রাত্রিতেও খোলা থাকে?"

"তবে কি? আপনি যে বল্লেন।"

"তোমায় জেলে যেতে এত সাধ কেন?"

"আপনি বলেছেন বলে?"

"আমি যা বল্‌বো, তাই কি তুমি কর্‌বে?"

"আর বোধ হয় করবো না।"

"দেখ, জেলে যাওয়া মিথ্যে। জেলে গেলে কিছুই হবে না। তোমার প্রেমের বঁধুর রক্ষা হবে না। তার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হবেই।"

"তা হোক, কিন্তু আমায় এখানে আন্‌লেন, ভদ্রলোক হয়ে!"

"দেখ, বড় সুন্দরী তুমি! তোমার সঙ্গে একটু নিরিবিলি কথা বল্‌তে বড় ইচ্ছা হয়েছে, দাও না, ঐ বোতল থেকে একটী গ্লাস পুরে আমার হাতে।"

"বুঝলাম্ তোমার মুরদ, এখন মানে মানে ফিরে চল।" মৃণালিনীর চোখ জ্বল জ্বল করিতেছিল। তাহার লাল মুখে দেহের রক্ত প্রবল বেগে ছুটিয়া আসিয়া সে মুখ আরও লাল করিয়া দিল। বাবু এক গুণ সোডায় চার গুণ সুরা মিশিয়ে পান করিয়া বলিলেন বহুৎ আচ্ছা। বোস্ মাই ডিয়ার, আমার এত বড় আশা বিফল কর্‌রো না।"

"তোমার এ বড় দুরাশা; শুনেছ ত, একটা ডাকাত আমার প্রণয়ী।"

"সেত চিরজীবনের তরে আন্দামানে গেল! তার জন্য ভেবে কেঁদে আর কি লাভ?"

"তোমার স্ত্রী আছে, তোমার এ দুর্ম্মতি কেন?"

"ঐ পেত্নী নিয়ে কি প্রেমের তৃষ্ণা মিটে! তুমি হুকুম কর, আমি ওকে জন্মের মত পরিত্যাগ কর্ত্তে প্রস্তুত আছি!"

"তবে ও কুৎসিতাকে বিয়ে করেছিলে কেন?"

"অনেক টাকা দিয়েছিল ওর বাবা।"

"ঐটাকে তোমাদের আইনের কেতাবে কি বলে?"

"তা বটে, ব্রিচ্ অব্ ট্রাষ্ট্! তা হোক্, ও রকম অনেকই হচ্ছে। কেতাবের কথা কাজে লাগে না, তুমিও ত স্বামী ছেড়ে ডাকাত ধরেছিলে। কি বল?

আবার পান! আবার উচ্চ হাস্য। এবার মৃণালিনীও হাসিল, না হাসিয়া কি থাকা যায়? এতগুলি আঁকা বাঁকা পাহাড় জঙ্গল ভাঙ্গিয়া তাহার এই ক্ষুদ্র জীবন স্রোতটা ভগবান বহাইয়া দিয়াছেন, এইটাই আশ্চর্য্য! এইটাই হাসির বিষয়। এতটুকু কীটের সঙ্গেও বিরাট বিশ্বের কর্ত্তার এমন লীলা খেলা! মৃণালিনী হাসিয়াই বলিল, "তাইত, এখন কি চাও তুমি?"

সে হাসি দেখিয়া বাবুর উৎসাহের সীমা নাই। "দেখ প্রিয়তবে! তুমিত আগেই আমায় অঙ্গুরি দান করেছ, আমি ত তোমায় কিছু দেই নাই। দেব এর পরে, অনেক দেব, ওকালতি করে যা পাব, তোমায় দেব। এখন থেকে খুব জোরে ওকালতি আরম্ভ করবো। আগে তোমার সাথে সেই আংটীই বদল করি, এটা হচ্ছে পরকীয়া প্রেম

কিনা, এতে আংটী বদলই শাস্ত্রে আছে!” বাবু আংটী খুলিয়া হাত বাড়াইল, মৃণালিনী ভাবিল, ক্ষতি কি, আংটীটা ফাঁকি দিয়েইত নিচ্ছিল। হাত বাড়াইয়া আংটী লইয়াই অঙ্গুলিতে পরিল। তার পর সে ঘর থেকে বাহির হইয়া চলিল।

বাবু তাড়াতাড়ি পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, “কোথা যাচ্ছ চাঁদ?”

মৃণালিনীর মুখ দিয়া আগুন ছুটিল, “সরে যাও হত ভাগা! তোমার শক্তি আমি বুঝে নিয়েছি। যা কিছু রক্ত ছিল, তার অর্দ্ধেক দিয়ে এসেছ কলেজে, তারপর দিচ্ছ এই ওকালতি ব্যবসায়ে, পয়সা উপার্জ্জনে। তার উপর আবার এই মদ, বিষ ভুলে খাচ্ছ, তুমি আমার কি কর্‌বে?” মৃণালিনী বেগে ধাবিত হইল, বাবু তার গতি রোধ করিতে পারিল না। ঘরের বাহির হইয়া মৃণালিনী গলি বাহিয়া চলিল, তখন রাত্রি হইয়াছে। সহরের সে জায়গাটা নিতান্ত কদর্য্য, আলো জ্বলে না, আঁধার, চারি পাশে খোলার বাড়ী। বিশ্রী দুর্গন্ধ ছুটিয়া আসিতেছে, কোনও কোনও বাড়ী হইতে কুৎসিৎ গানের আওয়াজ শোনা যাইতেছে। মৃণালিনী রাস্তা চেনে না, কতকদূর গিয়া, ঝাঁ করিয়া তাহার মনে পড়িল, এখন কোথায় যাইব? ভাইয়ের বাড়ী? ও ভগবান্! সে পথে যে কাঁটা পড়েছে, আরত সেখানে আমার স্থান নাই, আমি যে তাদের না বলেই ঘরের বার হ’য়ে এসেছি, সে ছিল যে অনাদরের আশ্রয়, এখন কোথা যাই? এইবার মৃণালিনীর পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া গেল। মৃণালিনীর তখন মনে পড়িল, বলদেব জ্যাঠামশাইকে, একমাত্র সেই জ্যাঠামশাই আছেন, যিনি নরক হইতেও তাহাকে তুলিয়া নিতে ঘৃণা বোধ করেন না। কিন্তু তাঁকে যে অতি রুক্ষ ভাষায়, নিতান্ত অবজ্ঞায় তাড়িয়ে দিয়েছি।

মৃণালিনী পথ চলা নিষ্প্রয়োজন মনে করিল। যার গন্তব্য স্থান নাই, সে আর পথ চলিবে কেন? চরণও চলিতে চায় না, তার যে দিকও নহে, লক্ষ্যও নাই। হায়! এতকাল পরে নিশ্চয়ই রাস্তায় নামিলাম। ওহো! আমি বিনয় রায়ের বড় আদরের মেয়ে! মাসে পঞ্চাশ টাকা ছিল আমার গৃহ শিক্ষকের বেতন!

---

(১৭)

একটা মেটে বাড়ীর সামনে একটু ছোট পাকা রোয়াক ছিল! মৃণালিনী সেইখানে বসিয়া পড়িল! সে স্থানটা আঁধারে ঢাকা ছিল। বড় কেউ লক্ষ্য করিল না। অবসন্ন দেহ মনে মিণী সেখানে গড়াইয়া পড়িল! তখন যেন ভাবনার বিষয়ও যুয়াইয়া আসিতেছে না। কি আর ভাবিবে? এত বড় মহাসাগরের পাড়ি কাটার শক্তির ওজনটা কি তাহার মত অন্দরবাসিনী বঙ্গললনা করিতে পারে? মৃণালিনী স্বেচ্ছায় সকল ভাবনা দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া, একটু হাল্‌কা হইয়াই রহিল।

তখন সেই ঘরের মধ্য হইতে বড় কাতর কণ্ঠে কোনও বালিকা বলিতেছে, "মা! আজ আমার বড় অসুখ করেছে, আজ বাইরে বস্‌তে পারবো না।

বড় নিষ্ঠুর রুক্ষ কণ্ঠে তার উত্তর হইল, "পারবিনিত চল্‌বে কিসে? দোরে যা বল্‌ছি কিন্তু ক্ষেমি, জানিসত আমায়।"

একটু পরেই দোরের কপাট আস্তে আস্তে খুলিয়া একটী চৌদ্দ পনর বছরের মেয়ে চৌকাঠের উপর আসিয়া বসিল। অল্প অল্প রাস্তার আলো যাহা পড়িয়াছিল তাহাতে তাহার মুখ দেখা গেল না। কিন্তু তার দীর্ঘশ্বাস যেন মৃণালিনীর গায় লাগিল। মৃণালিনীও দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িল।

বালিকা বলিল, "কে গা?" মৃণালিনী কি উত্তর দেবে, ভেবে আনিতে পারিতেছিল না, বালিকা আবার বলিল, কে ওখানে?" মৃণালিনী এবার কথা বলিল, "আমি একটা পথে পড়া মেয়ে, এই খানে একটু পড়ে আছি।"

বালিকা মৃণালিনীর কাছে আসিল, যত দূর দেখা যায়, ভাল করিয়া দেখিল। তারপর বলিল, তোমার বাড়ী কোথায়? মৃণালিনী উঠিয়া বসিয়াছে। বলিল, আমার বাড়ী কোথাও নাই। বাড়ী ঘর এখনও কর্ত্তে পারি নাই।

"তুমি কি ঘর নেবে? এ বাড়ীতে একটা ঘর আছে। তুমি ভদ্র ঘরের বউ দেখছি, এ পথে এলে কেন?"

"এ পথে আরাম নেই?"

"আরাম! পোড়া কপাল। যদি ঘরে যায়গা থাকে, তবে এমন যায়গায় কখনও এসো না।"

"তোমার কি যাবার যায়গা নাই?" মৃণালিনী যেন বুকের কান্না দিয়ে বড় কোমল করিয়া এই কথাটা বলিল। বালিকা সে কথা শুনিয়া যেন কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, "আমার তিন কুলে কেউ নাই?"

ভিতর থেকে তখন এক জন সাড়া দিল। "কে গা? লোক এসেছে খেমি?"

"হাঁ!" বলিয়া বালিকা চক্ষু মুছিল।

মৃণালিনী বলিল, "ও কে ?"

"বাড়ীওয়ালী ! চুপে চুপে কথা বলো ! বড় রাক্ষসী ও।"

"তুমি আমার সাথে যাবে ?"

"যাব।" নিতান্ত প্রাণের আবেগে নিঃসঙ্কোচ সাহসে বালিকা এ কথাটী বলিল।

"আমি যদি ওর চেয়ে রাক্ষসী হই ?"

"তুমি তা হবে না। হলেই বা, নূতন কিছুত হবে না।" জীব আগুনের ভিতর পড়িয়া, তাহা হইতে বাহির হইতে যেমন ছট ফট করে, মেয়েটীর যেন তেমনি অবস্থা। মৃণালিনী আদর করিয়া তাহার হাত ধরিতে গেল। সে হাত সরাইয়া নিয়ে বলিল, "উঃ ! ও হাতে ঘা, বড় ব্যথা ?"

"কিসের ঘা !"

"সকল শরীরেই ঘা। আমার সকল গায়েই বিষ।"

"কত দিন এসেছ তুমি ?"

"এই সবে দু মাস।"

"তুমি কি লোকের মেয়ে ?"

"কৈবর্ত্তের।"

"আচ্ছা ! চল এখনি। তোমার এখানে কোনও জিনিষ পত্র আছে ?"

"এক খানা ছোট কাপড়, আর এক খানা গামছা আছে।"

"সে থাক, দরকার নেই। চল।"

দুই জনেই রাস্তায় নামিয়া দ্রুত চলিতে লাগিল।

পথে চলিতে চলিতে বালিকা থমকাইয়া দাড়াইয়া বলিল, "একটা কাজত অন্যায় হলো, গায়ের এই গয়নাগুলি যে বাড়ীওয়ালীর।"

মৃণালিনী বালিকাকে হাত ধরিয়া রাস্তার আলোর দিকে একটু সরাইয়া, তাহার মুখ খানি ভাল করিয়া দেখিল। কি সুন্দর সরল মুখচ্ছবি। রোগে ভাবনায় অনুতাপে জীর্ণ, তবু কত কোমল। কত সুন্দর। এখনও হৃদয়ের সদবৃত্তিগুলি এমন ভাবে সতেজ রহিয়াছে। পরের দ্রব্য লইতে নাই, এখনও এ জ্ঞানটী তাহার তলাইয়া যায় নাই! মৃণালিনী সত্যকার প্রাণ দিয়াই বালিকাকে স্নেহ করিল। তাহার একটী গতি করিয়া দিতে হইবে বলিয়া সঙ্কল্প করিল।”

অদ্ভূত রমণী এই মৃণালিনী। এইত মুহুর্ত্ত পূর্ব্বে সে নিজের আশ্রয়ের জন্য অবসন্ন দেহমনে পড়িয়া ছিল। আর এখনই আর এক জনকে আশ্রয় দিবে বলিয়া সাথে নিয়া চলিল। কোথায় যাবে সে? একটা কিছু ভাবিয়া কাজ করিবার মতন সহিষ্ণুতা তাহার নাই, প্রাণের প্রেরণায়ই সে এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। মনের সঙ্গে ছলা পরামর্শ করিবার তাহার অবসর নাই। এত আঘাত বিপদে পড়িয়া তবু তাহার শিক্ষা হইল না।

দুই জনে অনেক পথ হাটিল। মৃণালিনীব অবসন্নতা গিয়াছে, বল বাড়িয়াছে। সে যে একটা বড় কাজ পাইয়াছে, আপনার কথা ভুলিয়াছে। গলি ছাড়িয়া বড় রাস্তায় পড়িয়াছে। সে রাস্তাটা গঙ্গার ধার দিয়া চলিয়াছে। দুই পারে অসংখ্য দীপরশ্মির মালা গাঙ্গে, অসংখ্য তরণীর সারি কূলে বাঁধা, তাহাতে কোনও কোনও নাবিক গান করিতেছে, রাস্তায় গাড়ী ঘোড়ার কোলাহলে তাহা ডুবিয়া আছে, তখন রাত্রি দশটা পার হইয়াছে, রাস্তার জনস্রোত কমিয়াছে। চৈত্রের নৈশ সমীরণে শীতলতা লাগিয়াছে। এতক্ষণে ভাবনা আসিল, কোথায় যাব? যেমন ভাবনা, অমনি শক্তিক্ষয়, অবসাদ আসিয়া মৃণালিনীর দেহ মন আঁধার করিল। সঙ্গের মেয়েটাও রুগ্ন,

আর চলিতে পারে না। একটা ঘাটে জনকয়েক কুলি, চট্ মুড়ি দিয়ে পড়িয়াছিল, তাহারা দু'জন গিয়া তাহাদের একপাশে বসিল। সেখানে আলোক খুব উজ্জ্বল, মৃণালিনী আবার ভাল করিয়া দেখিল মেয়েটাকে, মেয়েটী সুন্দরী নয়! একটু ফর্‌সা রকমের কালো। চোক মুখের গঠন ভাল ছিল, এখন রোগে বিশ্রী হইয়া গিয়াছে। তার হাতে পিঠে অনেক ঘা। গা থেকে দুর্গন্ধ আসিতেছে। তা হোক্, মৃণালিনীর সহানুভূতি আরও বাড়িল! সেই ক্ষত-ক্লেদ-দুর্গন্ধ বালিকাটীকে কোলের কাছে টানিয়া নিয়ে বলিল, "আগে তোমার ডাক্তার খানায় নিয়ে চিকিৎসা করে, তারপর বাড়ী পাঠিয়ে দেব।"

বাড়ী আমার কোথায় যে, সেখানে পাঠাবে?"

"তোমার বাপ ভাই, দেওর ভাসুর কেউ নাই?"

"ছিল।"

"এখনও ত আছে, তোমার বিয়ে হয়েছিল?"

"হ্যাঁ, আমি বিধবা। সে অনেক দিন, সাত বছর বয়সে।"

"তার পর।"

"তারপর আর কি? আমি ছিলাম দেওরের বাড়ী। সেখানে যা হবার তাই হলো, আমাদের পাপ প্রকাশ হ'য়ে পড়লো।"

"আমাদের কার? তোমার আর তোমার দেওরের?"

"তা বই আর কি? তখন দেওর তাঁর সমাজ বাঁচাতে আমাকে তাড়ালেন। এই রাক্ষসীর কাছে আমায় রেখে গেলেন। ওঃ! সে কি যাতনা! আমার গায়ে কি রক্ত আছে মা!" বালিকা শিহরিয়া উঠিল!

"থাক আর সে কথায় কাজ নাই। এখন আজকার রাতটা, এই খানেই কাটাতে হবে। তোমার বোধ হয় ক্ষিদে পেয়েছে, কিন্তু খেতে দিতে আমার কিছুই নাই।"

একটা পাহারাওয়ালা দূরে দাঁড়াইয়া ছিল। দু'জন মেয়ে লোক, দেখে কাছে আসিয়া বলিল, "তোহারা কাঁহা যাওগে রেণ্ডিলোক ?"

মৃণালিনী বলিল, "আমরা রেণ্ডি নই, মা বোন্।"

সে কথার ভাবে ও মুখের ভঙ্গিমায় পাহারাওয়ালার সাহস টুটিয়া গেল। সুর নরম করিয়াই বলিল, "কাঁহাসে আয়া, কাঁহা যাওগে ?"

"এ রাত্রিতে আর কোথায় যাব, এইখানেই থাক্‌ব।"

"এহি ত হুকুম নেহি।"

"এইত কতলোক পড়ে আছে।"

"এরা সব্ জানা কুলি লোক্। আওরত লোক এতনা রহনে আচ্ছা নেহি।"

মৃণালিনী বুঝিল পাহারাওয়ালার কথাটা ঠিক বটে। বলিল, "আমাদের এ রাত্রিতে কোথাও যাবার যায়গা নেই। তুমিত পাহারায় আছ। আমরা এইখানে দু'জন শুয়ে থাক্‌বো, তুমি একটু দেখো ?"

পাহারাওয়ালা দেখিল, থানায় জানাজানি করিতে গেলে সকল রাত্রিই জাগিয়া থাকিতে হইবে। তারপর যদি মামলা মোকদ্দমা বাধে, ছুটাছুটি করিতে হইবে অনেক, অথচ এরূপ ঘাটাঘাটিতে কোনও লাভ হয় না, তাহা তাহার জানা ছিল ভাল রূপ। আর দু ঘণ্টা পরেইত তার ছুটি, আরাম করিয়া ঘুমাইতে পারিবে। থাক আর ঘাটাঘাটিতে কাজ নাই।

সঙ্গের মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়িল। সে আশ্রয় পাইয়াছে, এটা তাহার নিশ্চিত বিশ্বাস, কিন্তু মৃণালিনীর কি নিদ্রা আসিতে পারে ? সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল ! এইত অগণ্য আলোকমালা-শোভিত অট্টালিকার সমুদ্র এ মহানগরী। এখানে কত সজ্জিত গৃহ কি শূন্য পড়ে নাই ? কত রাজভোগ কি ড্রেনে গড়িয়ে যাচ্ছে না ? আর আমরা এই দুটী

প্রাণী, নিরাশ্রয় উপবাসী। আচ্ছা, এই দুনিয়াটা সুধু শক্তির? না প্রেমের! সুধু পুরুষের? না স্ত্রীলোকরও এতে কোনও স্বাধীন অধিকার আছে? ভাবনার মধ্যে মৃণালিনীর মনে আসিল, এখানে নাকি পুরুষেরা একটা দল করেছে, নারীর দুঃখ নিবারণ করিতে! বেশ তারই অনুসন্ধান করা যাবে।

---

(১৮)

রাত্রিটা প্রভাত হইয়া গেল, যেন বড় তাড়াতাড়ি। মৃণালিনীর যেন ইচ্ছাই ছিল না যে, রাত্রিটা ভোর হয়। ক্ষেমী এখনও জাগে নাই। তার আজ বড় আরাম লাগিতেছিল! এমন নিরুদ্বেগে যেন সে অনেক দিন ঘুমায় না।

সেদিন গঙ্গা স্নানের বারুণীর যোগ। সূর্য্য না উঠিতেই স্বেচ্ছাসেবক যুবকেরা আসিয়া গঙ্গার ঘাটে সারি দিয়াছে। মৃণালিনীর বড় ভরসা হইল, ক্ষেমীকে ডাকিয়া সজাগ করিল। তারপর একটী স্বেচ্ছাসেবককে ইঙ্গিতে ডাকিয়া আনিয়া বলিল, "সহরে পতিতা স্ত্রীলোকের আশ্রয় কোথায় আছে, আমাদের সেইখানে একটু পৌঁছিয়ে দিয়ে আসুন না।" সে স্বেচ্ছাসেবকটী ছেলে মানুষ, বলিল, "আমি জানিনা, আমাদের ক্যাপটেনের কাছে জেনে আসি।"

একটু পরেই আর একজন যুবকের সাথে বালক ফিরিয়া আসিল, সে একজন সুন্দর, হাস্যময়, গৌরকান্ত শান্ত-সৌষ্ঠব যুবক! হরি! হরি!

এ যে মৃণালিনীর চেনা মুখ। এ যে শৈলের মণি! কি বিপদ! বিধাতা কি তার ভাগ্যে একটা মুহূর্ত্তও বিপদ ছাড়া লেখেন নাই? মণিও দেখিয়া চিনিল, সে যোড়করে নমস্কার করিল, "একি মাসী মা, আপনি?" বলিয়া মণি মাসীর পানে চাহিয়া রহিল, মৃণালিনীও বলিল, "হ্যাঁ বাবা আমি।"

"গঙ্গাস্নানে এসেছেন বুঝি?"

"না, পতিতাশ্রম খুঁজতে এসেছি।"

"সে কি? কেন?"

"জানত তুমি, আমি পতিতা?"

"সে মিথ্যা কলঙ্ক! থাক, এখানে আপনার সন্তানের বাড়ী আছে, আপন বোনের চেয়ে স্নেহের বোন আছে, আপনি আর কোন্ আশ্রয়ে যাবেন। আসুন আমি আপনাকে বাড়ী রেখে আস্‌ছি।"

আমি একা নই বাবা, এই দেখ না আর একজন নিয়ে দল বেঁধেছি।"

মণি দেখিল, এ মেয়েটা পতিতা বটে! কিন্তু এ মাসীমার সাথে এসে মিস্‌ল কি করে, একটু ভাবিয়াই বলিল, "তা হোক, তোমরা দুজনেই চল আমাদের বাড়ী, তারপর ওর একটা ব্যবস্থা হবে।"

"ছি বাবা! পতিতার আশ্রয় গৃহস্থের ঘরে হয় না। তুমি না পার, ঠিকানাটা বলে দাও। আমি নিজেই চিনে নেব।"

মণির সুন্দর মুখখানি কালো হইয়া গেল। তার অগত্যা বিশ্বাস হইল, মৃণালিনী পতিতা! দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "মা শুন্‌লে কত ব্যথা পাবেন, আমার উপর কত রাগ কর্‌বেন।"

"তোমার মাকে বলো, তার মিণী দিদি পতিতার আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছে, সেই ছাড়া তার গতি নাই। যদি আশ্রয় পাই, তবে একদিন তাকে দেখ্‌তে যাব মণি! বিয়ে করেছ?"

একি ? কোন্ কথার উপর কোন্ কথা ? মেয়েটার চকে এক বিন্দু জল নেই, অথচ মুখখানা পুত্রহারা জননীর ন্যায় বিশ্রী মলিন, ব্যথাহত। মণি হেট মস্তকেই দাঁড়াইয়া রহিল, মৃণালিনী বলিল, "বিয়ে এখনও করো নাই ? এত করে বলে দিয়েছিলাম শৈলকে ছেলের বিয়ে দিতে ! এখনও দেয় নাই পোড়ার মুখী ! যাব একদিন তাকে গাল দিয়ে আস্‌বো। তুমি আমাদের একটা ব্যবস্থা করে দাও।"

মণি অগত্যা একখানা গাড়ি ডাকিয়া, একটী ছেলে সাথে দিয়া, আশ্রমের ঠিকানা বলিয়া দিল।

মিণী ও ক্ষেমী এতক্ষণে পতিতাশ্রমে আসিয়া হাপ ছেড়ে বাঁচিল ! সেখানে বিশ্রামের স্থান পাইল। আরও পাঁচ সাত জন পতিতা সেখানে আশ্রয় নিয়াছে। তাহারা প্রশ্নের পশ্‌লা ঝরাইয়া নবাগতাদিগের বিশ্রাম ভঙ্গ করিতে লাগিল। মৃণালিনীর পরিচয় জানিবার কৌতুহল তাহাদের কিছুতেই নিবৃত্ত হইতেছে না।

মৃণালিনী ক্ষেমীকে বলিল, "কেমন আছিস্ ?"

ক্ষেমী বলিল, "বেশ আছি মা। আমার রোগ কি সার্‌বে ? তুমিত বলেছিলে ওষুধ কর্‌বে।" রোগের জ্বালায় তার দেহ মন ছাই হইয়া যাইতেছে। মৃণালিনী বলিলেন, "রোগ সারবে, এখানে ওষুধ কর্‌বে।"

মৃণালিনী আশ্রমের মুদ্রিত নিয়মাবলির একখানা কাগজ পাইয়া পড়িল, তাহাতে লেখা আছে, "বি, রায়, বার্ এট্ ল, অনারারি সেক্রেটারী !" বি, রায় ! কোন্ বি, রায় ? মৃণালিনীর আর একটা নূতন ভাবনা হইল। ক্ষেমীকে বলিল, "আমি যদি এখন চলে যাই, তুই এখানে থাক্‌তে পার্‌বি ত ?"

"না না, তা পার্‌বোনা। তুমি বুঝি তোমার সেই বোনপোর বাড়ী যাবে ? না না আমায় ফেলে যেও না। তাই বা থাক্‌বে কেন ?

তুমিত আমার মতন পাপী নও!” কত কাতর দৃষ্টি তার নয়নে!

মৃণালিনী বলিল, “না না আমি যাব না। তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা না করে আমি যাব না।”

সন্ধ্যার পর আশ্রমের সম্পাদক অসিলেন, আশ্রম পরিদর্শন করিতে। বাহিরের আপিস ঘরে আসিয়াই বলিলেন “ওহে শুনেছ! সেই ডাকাত গুলোর শাস্তি হয়ে গেছে, সাত বৎসর করে। কেবল এক জনের হয়েছে দু’বছর।”

যার সঙ্গে কথা বল্‌তে ছিলেন, তিনি বল্লেন, “তার মোটে দু’বছর হলো কেন?”

“যে ডাকাতিতে এরা ধরা পড়েছে, এ ব্যক্তি তাতে ছিল ব’লে প্রমাণ হয় নি। সে একখানা চিঠি লিখেছিল আর একজনের কাছে, তাতে লেখা ছিল, আর আমি ওসব কাজে যাব না! আমায় রেহাই দাও। এতে এক দিকে যেমন প্রমাণ হয়েছে, সে দলের মধ্যে ছিল, অপর দিকে প্রমাণ হচ্ছে, এ ডাকাতিতে সে নাই। তবে তার কাছে একটা রিভলভার পাওয়া গেছে! তার সে চিঠিতে ছিল, তোমাদের রিভলভার নিয়ে যেও, আমি রাখ্‌তে চাইনা। তবু তার কাছে বেপাশি রিভলভার পাওয়া গেছে, তাই সাজা হলো ২ বছর। আমার একজন চেনা লোক, ঐ ছেলেটার জন্য একজন বড় ব্যারিষ্টার দিয়েছিলেন, তাঁরই চেষ্টাতে এর সাজা কমে গিয়েছে। তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্ল্লাম, এ ছেলেটা তার কে হয়? তিনি বল্লেন, এমন কিছু নয়, তবে ওর জন্য কেউ কিছু কচ্ছে না, আমি একটু চেষ্টা কল্লাম্। ও হচ্ছে, অনুতপ্ত আসামী। এই ব্যাটারাই আমাদের বাড়ী ডাকাতি করেছিল, তার সন্দেহ নাই।”

মৃণালিনী কণ্ঠস্বর চিনিল, কথাগুনিও বুঝিল, ভগবান অসীম সহিবার শক্তি তাহাকে দিয়াছেন, সে সহিয়া লইল। দুই বছর মাত্র জেল বইত নয়. একরূপে কেটে যাবে। পাপের শাস্তি হওয়া চাই বইকি! কিন্তু কি স্নেহের প্রাণ বলদেব জ্যাঠার! আর কি নিয়তি আমার! ভাইএর বাড়ীতে একটু স্থান পাই নাই, তাঁর পতিতাশ্রমে আশ্রয় নিতে এসেছি!

পরিচারিকা আসিয়া বলিল, "সাহেব দেখা কর্ত্তে চাচ্ছেন, এসো এই ঘরে।" মৃণালিনী বলিল, "সাহেবকে বলো, আমি সেখানে আর কেউ থাক্‌লে দেখা কর্‌বোনা।"

ঝি ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "তাই হবে এসো?"

মৃণালিনী ঘরে প্রবেশ করিয়াই মাথায় কাপড় ফেলিয়া দিল। ভাইএর সামনে কি মাথায় কাপড় রাখা যায়? বাঙ্গালী সাহেবের মুখ পাংশু বর্ণ হ'য়ে উঠিল। সে ঘরে উজ্জ্বল বিজলি আলোক জ্বলিতেছিল। মৃণালিনী বসিয়া পড়িল দাদার পদপ্রান্তে, কাঁদিয়া বলিল, "দাদা! আমি সত্যি সত্যি পতিতা নই।"

দাদা রুষ্ট-তিক্ত স্বরে কহিলেন, "এখানে এলি কেন? আমার মুখ হাসাতে?"

"না দাদা, আমার কথায় বিশ্বাস কর। আমি জানিনা এ তোমার পতিতাশ্রম। আমিত সেই সাক্ষী দিতে এসেছিলাম কলিকাতায়? তুমি আমায় দেখেছিল, দৃষ্টিমাত্র মুখ ফিরিয়ে চলে গেলে। তাইত আমি তোমার বাড়ী না গিয়ে, ছোট দাদার বাসায় গিয়েছিলাম। জানি আমি তুমি বিলাতে গিয়ে খাটি সংসার ধর্ম্ম শিক্ষা করেছ। এ সংসারে লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখার অনেক হাঙ্গামা। তাই বিলাতের লোক বাপে পুত্রে সম্বন্ধ রাখে না। আজ এই পর্য্যন্ত থাক্, আমার

সাথে আর একটী মেয়ে এসেছে। সে যথার্থই পতিতা, রোগের বিষে জর্জ্জরিত। তাকে আশ্রয় দাও, চিকিৎসা করে তাকে বাঁচাও, সেইজন্য আমি এসেছি এ পতিতাশ্রমে! আর কিছু জিজ্ঞাসিলে আমি উত্তর দেব না।"

"তুই কি করবি মিনু?"

"আমি যখন ঘরের বার হয়েছি, তখন আর ঘরে যাব না। আমার উপায় কিছু কর্ত্তে যদি তোমার ইচ্ছা হয়ে থাকে, তবে আমার একটা চাকরী জুটিয়ে দাও, যাতে আমার ভাত কাপড় আশ্রয় মেলে।"

"বাঙ্গালী মেয়ের আবার চাকরী কি? যদি তুই একটা পাশ করা মেয়ে হতিস্, তবে মাষ্টারী মিলত।"

"না, আমি সে সব চাকরী চাইনা। শুনেছি হাসপাতালে রোগীর সেবা কর্লে খেতে পরতে ও থাকতে পাওয়া যায়।"

"হ্যাঁ, নার্সিং শিখ্‌লে চল্‌তে পারে বটে। ভবিষ্যতে উন্নতির আশাও আছে।"

"তবে আমায় সেখানে পাঠাও। তোমার বোন বলে পাঠিয়ো না। একজন দুঃখিনী বলে পাঠাও, তার জন্য কিছু খরচ লাগে, এই আংটীটী নাও। অনেক ডাকাতির হাতথেকে এ বাঁচিয়ে রেখেছি, এ আমার বাবার স্নেহের স্মৃতি! এ আমার স্বামীকে দেবার যৌতুক!"

দাদা আংটী লইলেন না। ভেবে দেখি বলে, ভগিনীকে আশ্বাস দিলেন। সেদিন আর আশ্রম পরিদর্শন করা হলো না। সকাল সকাল চলিয়া গেলেন।

মৃণালিনী এখন ভাবিতে বসিল। দাদার এ মতি হলো কেন? আপন বোনকে আশ্রয় দিতে শক্তি হয় নাই, প্রাণে বল পান নাই, একটা বারোয়ারী পতিতাশ্রমের দায়িত্ব নেবার প্রাণ কোথা হতে এলো?

এতে নাম আছে, প্রতিষ্ঠা আছে, দশ জনের কাছে জাহির হবার সুবিধা আছে। অথচ ব্যয়ের ভাবনা নিজের মাথায় নিতে হয় না। এমনি একটা কিছু কাজের মধ্যে না গেলে, বর্ত্তমানে কারু পশার জমে না! তার পর বলদেব জ্যাঠা! কিসের আশায় তিনি এই বৃদ্ধ বয়সে পরকে নিয়ে এত ব্যস্ত! ও এক রকমের মানুষ আছে, যারা পরের চ'কে জল দেখ্‌লে কেঁদে ফেলে, পরের বোঝা বইতে পেলে আনন্দ পায়! দারুণ মড়কের সময়েও আঁধার রাত্রিতে গামছা নিয়ে শ্মশানে ছোটে,—এদের কারু ডাক্‌তে হয় না, এ রকম দুটো চারটে লোক না থাক্‌লে ভগবানের রাজ্য চলে না। যেমন আকাশের মেঘ, তাকে ঝরতেই হবে। বনের ফুল,—তাকে ফুটতেই হবে। হৃদয়ের প্রেম,—তাকে গল্‌তেই হবে।

এখন, নলিনীরঞ্জন; তুমি ত দু' বছরের জন্য বেশ অবকাশ পেলে সংসারের ভাবনা জঞ্জাল হতে। জেলে বসে পাথর ভাঙ্গ, আর লপ্‌সি খাও; আমি এ দুটো বছর করি কি? তুমি কি বুঝতে পেরেছ, তোমার সেই দিনের নিষ্ঠুর ডাকাতি আমায় কেমন করে পাগল করেছে; তুমিত একদিন সেজে গিয়েছিলে বিনোদ মোহন বেশে, আমায় দেখ্‌তে! তখন পায় নাই একটুও আমায় মোহিত কর্ত্তে; কিন্তু ঐ যে আমার অবসন্ন দেহ পিঠ দিয়ে ঢেকে রেখে, তুমি বন্দুক হাতে দাঁড়িয়েছিলে, কি রাক্ষসের মত বীর মূর্ত্তি তোমার! তা যে এই এতদিনেও ভুল্‌তে পাচ্ছি না! তোমার মনুষ্যত্ব, তোমার বীরত্ব, আগুনের মত জ্বলে উঠেছিল, আঘাতে অবজ্ঞায়, অপ্রেমে! তা যদি আদরে যত্নে প্রেমে চাঁদের আলোর মত ফুটে উঠ্‌ত কি মধুর হতো তার স্পর্শ! তুমি জাননা হে দস্যু? আমাকে এই দুই বৎসর তোমার পথ পানে চেয়ে থাক্‌তে হবে। তুমি যদি ফিরে না এসো, তবে? তবে? তবে কি হবে?

দুই চারিদিন পতিতাশ্রমেই কাটিয়া গেল! মৃণালিনীর মন্দ লাগিল না। অপতিতা হইয়াও পতিতার মধ্যে আসিয়া মিশিল, সেজন্য তার মনে কোনও গ্লানি আসিল না। সত্যিকার পাপীর গ্লানি আসে, যে পাপীর অভিনয় করে, তার সে অভিনয় করে গ্লানি হয় না, বরং আনন্দই হয়। মৃণালিনীর যেন তাহাই হইল! সে যেন একখানা করুণ কাব্য পড়িয়া কাঁদিতেছে, যেন সংসার রঙ্গমঞ্চে করুণ দৃশ্যের অভিনয় দেখিয়া বিমোহিত হইতেছে! কি করুণ কাহিনী এই পতিতাদিগের? এদের বক্ষশোণিত দিয়াই সমাজ তার আইন লিখিয়াছে! নারী লইয়া সমাজের এমনি কিনি বিকি চলিতেছে! ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে মৃণালিনীর যে নারীত্বের তেজ দমিয়া আসিতেছিল, পতিতাদিগের করুণ কাহিনীতে তা আবার জ্বলিয়া উঠিল! বনের ফুলের মতন নারীগুলিকে পুরুষ খেয়ালের বশে বোঁটা ছিঁড়ে আনে, আবার খেয়ালের বশে ছুঁড়ে ফেলে দেয় আবর্জ্জনার মত ময়লা ফেলা মাঠে!

মৃণালিনী আশ্রমের কর্ত্রী হইল। আর সকলে কেউ তাকে, মা, কেউ মাসী, কেউ দিদি ডাকিল। সকলেই জানিল, সে তাদের মত পতিতা নয়। তার দেহে রোগ নাই, মনে বিকার নাই। মৃণালিনী পতিতা ভগিনীদিগের সেবা করিয়া বড় তৃপ্তি পাইল! তার আর যেতে ইচ্ছা হয় না, এ আশ্রম ছেড়ে! তার দাদা তার ডাক্তারি পড়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন, সে পাঁচ বছর পড়িতে হইবে, অনেক বই পড়িতে হইবে, অনেক যন্ত্র ঘাটিতে হইবে, মৃণালিনীর তাহাতে ইচ্ছা নাই। দুটী বৎসর মাত্র তার অবসর! তার পর তাকে কেউ রাখিতে পারিবে না কোনও

আইনে আটক করিয়া ! পড়িয়া বিদ্যালাভ করিতে সে আর চায় না। ডাক্তারি বিদ্যালয়ে গিয়া সে আর ছাত্রী হইবেনা, ধাইএর চাকরী করিবে, তা নিশ্চিতই। রাত জাগিয়া পীড়িতের সেবা করিবে,— কেতাবের পাতা উল্টাইতে পারিবে না।

সেদিন মণি আসিয়া বলিল, "মাসিমা ! যেতে হবে আমাদের বাড়ী। মা বড় কাঁদ্‌ছেন। এখনই, গাড়ি প্রস্তুত।"

আর যারা ছিল, তারা দেখে বিস্মিত হইল, এমন সুন্দর ছেলেটী মৃণালিনীকে মাসিমা বল্‌ছে ! তারাত আগেই বলেছে এ কোন্ বড় ঘরের মেয়ে।

মৃণালিনী বলিল, "যাব চল ! তোমার বাবাত দেখ্‌বেন না মণি ?"

"না, তিনিত আফিসেই থাকেন।"

"মণি ! এদের দেখেছিস্ ?"

"দেখেছি বই কি ? আমি এ আশ্রমের একজন মেম্বর আছি।"

"তোমরা এতে হাজার টাকা দিয়াছ ?"

"এত খবর আপনি রাখেন ?"

"তা রাখি, ফুল পায়ে মাড়ালে কেমন হয় দেখেছ ?" একটী রক্ত-শূণ্য জীর্ণদেহ পতিতাকে দেখাইয়া মৃণালিনী একথা বলিল, মণি কোনও কথা বলিল না। স্বভাবতই সে অল্পভাষী !

মৃণালিনী আবার বলিল, "দেখ মণি, সকল জিনিষ নিয়েই তোমাদের ব্যবসা, আস্তাকুড়ের ময়লা থেকে, পাহাড়ের পাথর খুড়ে মণি বার করে তোমরা ব্যবসা কর। মা বোন্ নিয়েও ব্যবসা কর, এটা কেমন অন্যায় ?"

প্রখরা মুখরা মেয়ে মৃণালিনী, পুরুষের উপর আবার তার রাগ বেড়ে উঠেছে, তাই মণিকে দেখে এ কথাগুলি তার মনথেকে ভেসে

বেড়ে উঠ্ছে! মণি ছোট করিয়া বলিল, "পুরুষের যা ব্যবসা, চুরি ডাকাতি, তাত নারীর জন্যই।"

মৃণালিনী যোগ্য জবাব পেয়ে চুপ করে গেল! সে উঠিয়া কাপড় ছেড়ে এসে বলিল "চল!" ক্ষেমীকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে, মৃণালিনীকে বাধা দিবার কেহ ছিল না।

শৈলর প্রকাণ্ড বাড়ী! অতুল বৈভব? যে ঘরে শৈল বাস করে, তারই বা কি সৌষ্ঠব! এ ঘর সাজাতে যে লক্ষ টাকার প্রয়োজন হয়েছে! এত পোড়ানিও শৈল সয়ে আছে? তাকে ধন্যবাদ! দুঃখের জীবন দুঃখের ভিতরেই কাটে ভাল। উনুনের আগুন, উনুনেই জ্বলে ভাল, তাকে রংদার ফানুষে ঢাকৃতে গেলেই ফানুষ ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে! এত ভোগের মধ্যেও আঠার বছরের যুবতী মনের আগুন সামলিয়ে আছে, দেবতার মতন শক্তি আছে বটে তার। শৈল কার্য্যান্তরে ব্যস্ত ছিল, এ ঘরে আসিতে তার একটু বিলম্ব ঘটেছিল, তাই মৃণালিনী একটু ভেবে নেবার অবসর পাইল। শৈল আসিয়াই ঝাপাইয়া পড়িল দিদির কোলে! তার হৃদয়-প্রস্রবণের দ্বার খুলে গেল, শৈল অনেক কাঁদিল। মৃণালিনীকে দেখিলেই তার কান্না আসে, সে দিনও কেঁদেছিল, আজও কাঁদিল। এ ছাড়া তার বিবাহের পর সে আর কোনও দিন কাঁদে নাই।

মৃণালিনীই আগে কথা বলিল, "ছি শৈল! এখনও ছেলের বিয়ে দিস্ নি? এত করে বলে দিয়েছি?"

"মণির বিয়ে? এখনও দিতে পারি নাই।"

"হ্যাঁ মণিরই বিয়ে, এখনও দিস্ নি? অত সাহস ভাল না। এই বৈশাখেই বউ বরণ করে ঘরে আন্।"

"আগেই তোমার এই কথা?"

"হ্যাঁ! আগেই এই কথা, এই কথা কহিতে এসেছি। তারপর আবার সুখ দুঃখের ইতিহাস? ওত বাজে আলাপ মাত্র, কোনও কাজে আস্‌বে না।"

অতঃপর মৃণালিনী শৈলবালাকে সকল কথা খুলে বলিল। বেশ হেসে হেসে, ছাঁদিয়ে বিনিয়ে বলে গেল, কলিকাতায় আসার কাহিনীটা। শুনে শৈলের গা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল। সে বলিল, "কি ডাকাত? তুই ভাই মেয়ে মানুষ নোস্‌।"

"আমি ডাকাতে মেয়ে মানুষ বটে। আমি ডাকাত করে দিয়েছি একটা ভাল মানুষকে, ডাকাত আমি ভালবাসি, ডাকাত আমার বর, জানিস্‌ত সকলই।"

"ভাল, তাঁর সে মামলায় শেষ কি হলো?"

"দুটা বছর মাত্র জেল হয়েছে, তারও এই চা'রদিন কেটে যায়।

"দু'বছর পরে তিনি খালাস হয়ে এলে কিরূপ হবে?"

"কি আর হবে? আমাদের বিয়ে হবে।"

"তিনি তোমায় বিয়ে কর্‌বেন তার বিশ্বাস কি? তার যদি আগে বিয়ে হ'য়ে যেয়ে থাকে? আবার যদি ডাকাতি কর্ত্তে যান?"

"তাকি হ'তে পারে? নারীর প্রেমের আঁচলের বাতাস গায়ে লাগ্‌লে কি পুরুষ ডাকাত হ'তে পারে? আর তিনি যদি আমায় ভাল না বাসবেন, অন্ততঃ মনে না রাখ্‌বেন, তবে আমার বাড়ীতেই ডাকাতি কর্ত্তে যাবেন কেন? আর সেই ডাকাতির পর তাঁর ডাকাতি চাকরীতে ইস্তফা দেবেন কেন? শৈল, তুই ভাবিস না, তাঁকে এনে তোকে দেখিয়ে যাব, যদি যমের মুখ থেকে কাটিয়ে রাখ্‌তে পারি।"

মৃণালিনীর চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল! তারপর খাওয়া দাওয়া হইল, বাজে সুখ সুবিধার কথা হইল। শৈলের স্বামী বেলা ১২টায় তাঁর গদি

থেকে ঘরে এলেন। শৈল চলিল স্বামীর তত্ত্ব লইতে। মৃণালিনী বলিল, "ওঁর সঙ্গে একটু আলাপ করে যাব না?"

"আচ্ছা? এখন একটু বিশ্রাম কর।" বলিয়া শৈল চলিয়া গেল।

মৃণালিনী ততক্ষণ মণিকে ডাকিয়া আলাপ করিতে লাগিল। বিশ্রাম ভাল লাগে না। বিশ্রাম করিতে গেলেই, বন্যার স্রোতের মতন চিন্তা আসিয়া তার আঘাত-ক্ষত-জীর্ণ মনটার উপর ঘা মার্‌তে থাকে। তার যে একটা যা তা কিছু নিয়ে থাকাই তার ভাল। মণির সঙ্গে আলাপের সূচনা এই রূপেই হইল।—"এই যে ফল শস্য, ধনরত্ন পূর্ণ, নদনদী শোভিত পৃথিবীটা, এতে ভোগ বিলাসগুলি কারু পিছে পিছে ছুটে যাচ্ছে,—আর কেউবা পেটের আগুনে জ্বলে রাস্তায় পড়ে রোদ বৃষ্টি ভোগ কচ্ছে, এর কি কোন বিধাতা আছে?" মণিও লেখাপড়া শিখেছে, উত্তর করিল, "Survival of the fittest.—ভোগ বিলাস আপনি সেধে কারু আয়ত্ত হয় না, যে স্বকর্ম্মের ফলে তাদিগকে আয়ত্ত কর্ত্তে পারে, তারই অধীন হয়ে পড়ে। দারিদ্র্য জীবের কর্ম্ম ফল! যারা রাস্তার পড়ে খেতে পায় না, খেতে পাওয়ার মত তারা কিছুই কচ্ছে না।"

"আমি এমন কি কর্ম্ম করে এসেছি যে, আসা মাত্রই তোমাদের ঘরে এই থালা পোরা লুচি ক্ষীরের মণ্ডায় পেট ভারি করে, এখন নড়্‌তে পাচ্ছি না। কর্ম্ম না করেও এমনি জুটে গেল?"

"আপনি না করেছেন, আমি করেছি। আপনি আমার মায়ের বোন্ মাসিমা, আমার কর্ম্মের ফলে আপনার অংশ আছে।"

"বউ মা এসে যখন তোমার কর্ম্মফলের ষোল আনা অংশী হয়ে দাঁড়াবেন, তখন আমাদের অংশগুলিও বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে?"

মণি হাসিল। এতবড় বিষয়টার এমন ভাবে অবতারণা করে মাসিমা যে সেটাকে এমন তরল রহস্যে নামিয়ে দেবেন, তা ভেবে সে কথাটার উত্তর দিয়াছিল না। কিন্তু মাসীমার যে এর চেয়ে গভীরতার দিকে নামিবার উৎসাহ নাই, তাত সে বুঝিতে পারিল না। সে বুঝিল, মেয়ে মানুষে আর কতটাই বা বোঝে ?

তখন কথা হইল তার মা তাকে কেমন ভালবাসেন ? কেমন খেতে দেন ? কেমন তত্ত্ব বার্ত্তা লন্। মণি এ কথায় বড় তুষ্ট হইল না, তার এ মা যে, তার আসল মা নন্, বিমাতা, তা সে মনে আন্‌তেই ভালই বাসে না, বরং তাতে তার প্রাণে দুই রকম ব্যথা জেগে ওঠে। এক ব্যথা তায় স্নেহময়ী গর্ভধারিণীর জন্য ; যদিও বিমাতা তাকে যত্ন আদর করিতে একটুকুও অবহেলা করেন না, তবু মায়ের মুখ কি সন্তানে ভুলে যায় ? আর একটা দুঃখ যা, তা কারু কাছে বল্‌বার নয় ! তাঁরই পূজ্যপাদ পিতা আত্মসুখের কামনায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সে যে এই সরলা বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, এটা তাঁর একটা মহাপাপ গুরুতর অপরাধ। মণি সর্ব্বান্তঃকরণে তাহা বুঝিত, শৈল তার বিমাতা, এই কথাটা মনে উঠিলেই সে পিতার অপরাধ স্মরণ করিয়া কুণ্ঠিত হইয়া উঠিত। মাসিমার সঙ্গে আলাপ অপ্রিয়কর হইতে চলিল দেখিয়া মণি উঠিয়া গেল। “আপনি বিশ্রাম করুন।” এইমাত্র বলিয়া শিষ্টতা রক্ষা করিয়া গেল। মৃণালিনী কিন্তু যা বলিবে ভাবিয়াছিল, তা বলা হইল না। সে বলিতে যাইতেছিল, এ পৃথিবীটা যদি স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সমান ভোগের বস্তু, তবু বাংলার পুরুষগুলি নারীদিগকে এমন কোণঠাসা করে রেখেছে কেন ? এই যে এত পতিতা নিগৃহীতা, অনাথা, বিপথে চালিতা, এদের জন্য পুরুষ কি অধিক দায়ী নয় ? তাদের পাতিত্য পাপের অর্দ্ধেক, কোথাও বা যোল আনা ভাগী কি পুরুষ নয় ? পুরুষ যে বাবা হয়ে

কন্যা বিক্রয় করে পাপের পশারীর কাছে, ভাই বোনকে দেয় লম্পটের করে ? পতি হয়ে পত্নীকে বিকায় অর্থের বিনিময়ে ! এ সব বলা হইল না বলিয়া, মৃণালিনীও অগত্যা বিমনা হইয়া শৈলর বহুমূল্য শয্যায় শুইয়া পড়িল ! এই আরাম ! এই হাওয়া, এই সুগন্ধ, এর ভিতর পরে অভাগিনী শৈল কি আগুনই পোহাচ্ছে ! তার চেয়ে ডাকাতের পথ পানে চেয়ে আমি সহস্র গুণে ভাল আছি ।

খানিক পরে স্বামীর সঙ্গে শৈল আসিল। মৃণালিনী তাকে অভিবাদন করিল, এ ব্যক্তি প্রৌঢ় বটেন, কিন্তু বেশ সুস্থ কর্ম্মঠ ! মৃণালিনীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কি বলিবেন তা বোধ হয় ভাবিয়া আনিতে পারিতেছেন না। মৃণালিনী আগে কথা বলিল, "আপনাকে একটা পরামর্শ দিতে এসেছি ! মনে কিছু করবেন না জামাই বাবু।"

বৃদ্ধ বিনয়ে সঙ্কুচিত হয়ে বলিলেন, "না না, মনে কি করবো ? শুনেছি আপনি পরমবুদ্ধিমতী।"

"তা বেশ, এখন কথা হচ্ছে, এমন আঠার বছরের সুন্দরী বউ ঘরে এনে এখন কি আপনার বাইরে বাইরে টাকা কুড়িয়ে বেড়ান সাজে ? এত দ্বিতীয় পক্ষের রীতি নয়।"

"তা বটে ! তবে সে দোষ আমার চেয়ে আপনার বোনেরই বেশী। তিনি আটকে রাখলে কি আমি যাই !"

"সে দোষও আপনার ! আঠার বছর পঞ্চাশ বছরকে আঁকড়ে ধরতে নাও পারে, আপনার ত আঁচল ছাড়া উচিত নয়।"

ব্যঙ্গটা বড় উচিত রকমের হয়ে গেল। শৈল কটাক্ষ করিল, জামাই বাবুর মুখেও কুণ্ঠার চিহ্ন প্রকাশ পাইল। মৃণালিনী তা বুঝিল, কথাটা একটু কোমল করে বলিল, "কথাটা হচ্ছে কি ? এমন যোগ্য ছেলে

বিষয় কর্ম্মটা তাকেই বুঝিয়ে সুজিয়ে দেন। আর ছেলের বিয়ে দিয়ে একটী বউ ঘরে আনেন। তার পর দু'জন শিব গৌরীর মতন যোড়বেঁধে কিছুদিন তীর্থঘুরে দে। বিদেশ দেখে আসুন। শৈলর এইটাই হচ্ছে, ও ছেলে বেলা থেকেই কিছু লাজুক, তাই বল্‌তে পারে না; বুঝ্‌লেন?"

"আমারও ইচ্ছা, কিছুদিন একটু পশ্চিমে বেড়াতে যাই।"

"এই দেখুন দেখি, দু'জনের ইচ্ছাই এক; ভিতরে ভিতরে বিদ্যুৎ চলে কি না? ওটা হচ্ছে পবিত্র প্রেমের ধর্ম্ম!"

"এই বৈশাখেই কাশ্মীর যাব, ভেবেছি।"

"ছেলেটার বিয়ে দিয়ে যাবেন না?"

"বৈশাখেত হবেই না, ছেলের জন্মমাস, আর মণি যে বিয়ে কর্ত্তে চায় না। বলে আর দু'বছরের মধ্যে সে বিয়েই কর্‌বে না।"

"কর্‌বে, আগে তাকে আফিসের কাজ দেখ্‌তে দিন! অমন যোগ্যি ছেলে বসিয়ে রাখ্‌তে আছে?"

"এই বৈশাখেই আমরা কাশ্মীর যাব। আপনি যাবেন? চলুন না?"

"আপনারা যাবেন যোড় বেঁধে, আমি বে-যোড়াই গিয়ে মারা পড়্‌বো?"

"আপনার যোড়া কি মিল্‌বে?"

"মিল্‌বে বই কি? কত যাট বছরের যোড়ভাঙ্গা রত্ন কুড়িয়ে পাব।"

বৃদ্ধ দাঁত খুলে হাসিলেন বটে, কিন্তু আস্তে আস্তে নমস্কার করে চলে গেলেন। শৈল বলিল, অমন বাক্যজ্বালা কি মানুষকে দিতে হয়?"

"ব্যথা পেলি যেন। দেখ্‌ শৈল, তুই যে এত বড় স্বামী ভক্তি দেখাস, একটা বেচারীর উপর দয়াপরবশ হয়ে, না পতি ভক্তির ফলে স্বর্গে যাবি বলে।"

শৈল বড় দুঃখিত হইয়া যেন বলিল "মনে কর স্বর্গ পাব বলে।"

"মিথ্যা কথা, ও পতি সেবার স্বর্গ হয় না। মাটীর পুতুল পূজা কল্লে, সে পূজা দেবতায় গিয়া পৌছে, যদি সেই মাটীর ঠাকুরকে সত্যিকার দেবতা বলে ধ্যান করা যায়। কিন্তু মাটী বলে বুঝে যতই ফুল চন্দন ঢাল, কোনও ফলই হবে না। মিথ্যাচারের জন্য বরং পাপই হবে, ভণ্ডামির দণ্ড পাওয়াই তার পরিণাম।"

শৈল আরও কালোমুখে বলিল, "তবে না হয় মনে কর—দয়া করে!"

"না ও অপাত্রে দয়া। কুষ্ঠ রোগীকেও দয়া করা উচিত, কিন্তু ঐ পাপিষ্ঠ অতিলোভী পুরুষগুলিকে দয়া করাই পাপ।

পেটুক উদরাময় রোগীদিগকে দয়া কল্লেই তার অনিষ্ট করা হয়। দয়াই নারীর স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা, দয়া করেই তারা সয়ে নেয় সকল রকম বুক-ভাঙ্গা অত্যাচার। নইলে পুরুষ এমন নারীর প্রভু হতে পার্ত্ত না। পুরুষ যে নারীর কাছ থেকে সকল অধিকার কেড়ে নিজস্ব করে নিয়েছে, সে কেবল নারী দয়াশীলা বলে, অক্ষম অবলা বলে নয়।"

শৈল কতক্ষণ নিরস্ত রহিল, পরে বলিল, "না দিদি, বৃদ্ধ হলেও লোকটার হৃদয় আছে। সাময়িক মোহবশে অনুচিত কাজটা করে ফেলেছেন বলে, রক্ত শুকান চেষ্টায় তার প্রতিকার কর্ত্তে চেষ্টা করেন। তিনি সর্ব্বস্ব দিতে প্রস্তুত, যদি আমি সুখী হই।"

"ঐত ভণ্ডামি, গাছের গোড়া কেটে আগায় জল ঢেলে তাকে বাচাতে চেষ্টা করা। থা'ক, তোর স্বামীর ভণ্ডামি না হয় সয়ে গেলুম, তোর ভণ্ডামি কিন্তু মোটেই সহ্য হয় না।

"আমার কি ভণ্ডামি দেখ্‌লি?"

"ভণ্ডামি নয়? তুই যেন যাত্রার রাণীর মত সতীর অভিনয় করে যাচ্ছিস। কি কপটতা তোর এই পতিভক্তি? প্রেম না হইলে কি ভক্তি হয় রে? তোর ভক্তি যেন মাখম তোলা দুধের দই, যে চতুর গোয়ালা সেই সে রকম দধি জমাতে জানে। আমি চতুরতাকে মনুষ্যত্ব মনে করি না।"

"তুমি এমন হলে কি কর্ত্তে?"

"আমি দিন রাত একশ বার চোক্ গরম করে বল্তাম, হুঁশিয়ার নরাধম! শত জন্মএ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর।"

"যাই বল, তোমার ডাকাতের চেয়ে ভাল। মিষ্টভাষী, নিরীহ, পরোপকারী।"

"আর আমার ডাকাত কি জানিস্? মহাবীর, সত্যপরায়ণ, মিথ্যা ভণ্ডামি-রহিত খাটি মনুষ্যত্বের উপাসক। নিজেও মানুষ।"

"আচ্ছা বেশ! চল এখন আমার শয়ন ঘরে।" বলিয়া শৈল মৃণালিনীকে হাতে ধরিয়া অন্য ঘরে গেল।

শয়ন কক্ষে গিয়া মৃণালিনী দেখিল, বহু মূল্য পর্য্যঙ্কে বহু মূল্য শয্যা বিস্তৃত। যেন দিনে পাঁচ বার তাহা ঝাড়া পোছা হয়। আবার পার্শ্বেই আর একখানা চৌকীর উপর একটী মাদুর পাতা। সে মাদুরে শুইবার লোকের গায়ের দাগ বসিয়া রহিয়াছে। বালিশের উপর মাথার দাগ, এক পাশে হাতের কঙ্কনের পালনপাতাটা আকিয়া গিয়াছে। মৃণালিনী বলিল "এ আবার এক খানা চোকিতে কে শোয়?"

শৈল বলিল "বড় গরম লাগলে এইখানে এসে চুপে চুপে একটু শুই।"

"গরম বোধ হয় প্রতিদিন লাগে! পরম পাপিষ্ঠা আর কি? তবু বল্‌তে পার না যে বাপের বয়সী স্বামীর সঙ্গে শুয়ে ঘুম হয় না।"

দরজার কাছে এসে শৈল মৃণালিনীর হাতখানি ধরে তাতে একখানি একশ টাকার নোট গুজিয়া দিয়া, অশ্রুভার রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "দিদি! বোনের এ প্রণাম গ্রহণ কর্ত্তে হবে।"

মৃণালিনী দেখিয়া বলিল, "তা নেব বই কি? টাকার আমার দরকার আছে।"

শৈল বলিল, "শুন্‌লাম তুমি ডাক্তারি পড়িতে যাচ্ছ। তার সমস্ত খরচা আমি দেব, প্রতিমাসে পঞ্চাশটী করে টাকা আমি দেব। জানত আমার টাকার অভাব নেই।"

শৈলকে পায়ের ধূলি দিয়া মৃণালিনী গাড়ীতে উঠিল। মণি সাথে গেল, তাকে রেখে আস্‌তে।

মৃণালিনী ডাক্তারি বিদ্যালয়ে গেল। ডাক্তারি পড়িতে কিছুতেই রাজি হইল না। সে বলে ঔষধ দিয়ে লোক বাঁচিয়ে ফল কি? যারা মর্‌বে মরে যা'ক। তার চেয়ে যারা মরতে পড়েছে, তাদের সেবা করে, তাদের রোগ যাতনা, মরণ ক্লেশ, যতটা লঘু করা যায়, তাতে বরং পুণ্য আছে, ঔষধ না হলেও লোক বাঁচে, কিন্তু সেবার অভাবেই মরে যায়। আমি চিকিৎসা শিখিব না, সেবা শিখিব। মৃণালিনী ধাত্রী-বিদ্যা শিখিতে ভর্ত্তি হইল। তাতে বিশেষ কোনও খরচ নাই খাওয়া পরা পরিশ্রমের বিনিময়েই পাওয়া যায়!

কাশ্মীর হইতে শৈল টাকা পাঠাইল, আর পত্র লিখিল, "দিদি! কি সুন্দর এই পাহাড়ে দেশ; কত সুন্দর রাশি রাশি ফুল ফোটে

এখানকার বনে উদ্যানে? বড় শোভা স্বচ্ছ-জলভরা হ্রদ গুলির। আমরা একটা হ্রদের ধারে বাসা লইয়াছি। সত্যই স্বামী এখানে এসে নবীন নাগর সেজে বসেছেন! পাহাড়ে বাতাসে, ফুলের সুবাসে, চির বসন্তের পরশে, দ্রাক্ষা ন্যাসপাতির রসে, কোকিলের ডাকে, ময়ূরের নাচে, পার্ব্বতীয় সুন্দরীদের হাসে গানে, তার যেন যৌবন জোয়ারে নূতন বান আস্‌ছে। আমরা প্রেমিক প্রেমিকার মত অভিনয় কচ্ছি! পাহাড়ের আড়ালে সূর্য্যোদয় দেখি, হ্রদের বুকে চাঁদের নৃত্য, পর্ব্বতের গায়ে বিদ্যুতের ছুটাছুটি দেখে, কত হাস্‌তে চেষ্টা করি। আমি হ্রদে নেবে সাঁতার কাটি, আমার স্বামীও আমার সাথে সাঁতার কাটেন। তা দেখে কেউ হাসে না। সেদিন দেখ্‌লাম্‌, একটা চল্লিশ বছরের বুড়ী মেমের একটা পঁচিশ বছরের ছোক্‌রা সাহেব প্রেমিক! এক এক দেশের এক এক রীতি!

আমার স্বামী তোমার বুদ্ধির বড় তারিপ করেছেন। তিনি বলেন, তুমিই তাকে এখানে আস্‌তে পরামর্শ দিয়েছ। নইলে এত আনন্দ, এত স্ফূর্ত্তি কি তিনি ভোগ কর্ত্তে পার্ত্তেন? এখন তার উচ্চ-হাস্য দেখ্‌লে তুমি কখনই তাকে ত্রিশ বছরের বেশী ভাব্‌তে পার না।

তোমার মনের জ্বালার কথা জানিয়া আর লাভ কি? উনি শীঘ্র বাড়ী ফির্‌বেন বলে বোধ হয় না। আমি তাঁর ব্যবসায়ের লোকসানের কথা মনে করে দিয়ে থাকি। তিনি বলেন, থা'ক, দুটো দিন তোমাকে নিয়ে একটু আনন্দ করি। সত্যি ভাই, এখানে ষাট বছর ত্রিশ বছরে নাম্‌তে দেখেও,—আমার দুরদৃষ্ট, আমি কিন্তু সে ষাট বছরের ছবিখানা মুছে ফেল্‌তে পারি নাই।

ভাই! মণিকে দেখো। মাঝে মাঝে তার তত্ত্ব নিয়ো, তার খাওয়া শোয়ার বড় কষ্ট হচ্ছে! আসবার বেলায় তাকে কাঁদ কাঁদ দেখে এসেছি।

ভাল কথা, এখানে এসে ভাই আর এক জ্বালায় পড়েছি। কর্ত্তাটী এখানে এসে মদ খাওয়া ধরেছেন। তাকে কে যেন বলেছে, মদ খেলে যৌবন ফুলে ওঠে! যৌবন ফিরে পাবার জন্য তাঁর যে আকুলি বিকুলি আকিঞ্চন! বোধ হয় অনেকটা আমারই জন্য! তবে যেদিন মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়েন, সেদিন সে সং দেখে বড় জ্বালাতন হ'তে হয়। তার আবার জন দুই এয়ার বন্ধু জুটেছে। তার মধ্যে একটা ডব্‌কা ছেলে। যৌবনের অভিনয় কর্ত্তে হলে, যুবক অভিনেতার সাহচর্য্য লাগে বই কি! আরও একটা কথা আছে, তা আজ থাক্‌, পরে লিখ্‌বো।

মৃণালিনীও শৈলের পত্রের উত্তর লিখিল। "ভগিনি শৈল! তোমার পত্র পেয়েছি! তুইত পাহাড় পর্ব্বতের কত খবর দিলি, আমি যম রাজার রাজ্যের কিছু খবর দেই। এ তিন মাসের মধ্যে আমি বাট্‌টে জীবনের শেষ নিশ্বাস ছাড়্‌তে দেখেছি। গভীর রাত্রিতে মড়া ঢেকে রেখে, আর একটা মরণ পথের পথিকের কাছে বসে সময় গণি। আবার গোটা চল্লিশেক মানুষ যমের কাছ থেকে কেড়েও রেখেছি! তার মধ্যে অনেকেই দেখ্‌তে পাই মলেই ভাল ছিল। বেঁচে থেকে খাবে কি? আমিত বুঝ্‌তে পারি না, তারা কেন হাসপাতালে বাঁচতে এসেছিল, বেঁচেই তাদের মরণ। তারা সকল দিন খেতে পাবে না, যেদিন পাবে, তা আধপেটা, অখাদ্য। শোবে রাস্তায় বা নরকের চেয়ে ভীষণ স্থানে! তাদের আবার বেঁচে ফল কি? এমন যারা বেঁচে যায়, তাদের আমি পাঁচটী করে টাকা দিচ্ছি, তোমার দেওয়া টাকা আমার হাতে থাকে। আমার ত টাকা লাগে না। আমি এখানে খেতে পাই, আরও কিছু কিছু মাইনে পাই। তুমি টাকা পাঠিও, আমি তোমার টাকার পুণ্য কিন্‌বো।

আমার দু বছরের এই ৪ মাস হতে যায়! আর ১৯ মাস ২৯ দিন মাত্র বাকি আছে, আমি ঠিক হিসাব করেছি।

তুমি যে একটা কথা লিখ্‌তে গিয়ে গোপন করেছ, তা আমি বুঝে নিয়েছি। তোমার স্বামীর সঙ্গের এবার সেই ডবকা ছেলেটা বুঝি তোমার উপর একটু আড় চোকে চেয়েছে! সে বোধ হয় ভেবেছে, বুড়োর মেয়ে মানুষ, সহজেই বাগে আস্‌বে। দিস্ তাকে দুটো চাহনির বাণ ছেড়ে, ছোড়া বিষকাঁটার ফোঁড় খেয়ে একটু ছট্ ফট্ করুক। ও জা'ত নিয়ে বাঁদর খেলা খেল্‌তে এখনও আমার সখ্ আছে। তোমার স্বামীকে আমার নমস্কার দিও। তোমার প্রণাম আমি তুলে রাখ্‌ছি, এক সময়ে আশীর্ব্বাদ দেবো।"

---

(২৭)

দুই বৎসর কাটিতে চলিল! মৃণালিনীর মনের উৎসাহ কেমন দমিয়া আসিতেছে। সে ভাবিতেছে, আমি যে আকাশে সৌধ রচনা করিতেছি না, তার বিশ্বাস কি? আমার এ আশার সৌধ ত ধর্ম্মের উপর নয়, একটা সাময়িক দুরন্ত-পণার উত্তেজনার ফলে, এতগুলি বিরোধ বিপদের মধ্যে আমি জীবনটাকে বহিয়া আনিয়াছি! এই জন্য পিতা মাতা স্বজনের অনুরাগ হারাইয়া বিরাগ ভাজন হইয়াছিলাম। তার পর পিতা মাতা হারাইয়াছি, ভাই বন্ধু হারাইয়াছি, এত স্নেহের প্রাণ বলদেব জ্যাঠার, তাঁকেও ব্যথা দিয়া সরাইয়া দিয়াছি। এ সকলই

অন্যায় অবিচার ? এই ত এই সারা পৃথিবীর মানুষগুলি, সমাজের শাসনে স্বজনের বন্ধনে, সুখে দুঃখে সংসারে কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া যাইতেছে ! আমার এ দুরন্তপণা কেন ? এতদিনে আমি হয়ত সুখের সংসারে গৃহিণী হইতাম, কতাদিক দিয়া কত জনের স্নেহ প্রীতি আসিয়া হৃদয় ভরপুর করিয়া দিত ! আর আজ! আজ আমি সংসারের কেহ নয় ! এ দুরন্তপণা নারীর সাজে না।

দস্যু, পরস্বাপহারী নলিনীরঞ্জন ! যার পুরুষ দম্ভ আমি একদিন তৃণের মতন লঘু ভেবে ব্যঙ্গে উপেক্ষায় মলিন করে দিয়েছি, আবার তাকেই ভেবে নিলাম পুরুষ রত্ন ! এ যে আশ্চর্য্য ! সে এসেছিল প্রাণান্ত প্রতিহিংসায় আমার সর্ব্বস্ব লুটে নিতে. তাইত আমি তার বীরত্বে মুগ্ধ হয়েছিলাম ! কি দেখিয়া মজিলাম তাতে ? তার বীরত্ব ? তারপর তার দুঃখ দৈন্য, কঠোর দণ্ড, কি অপমান নির্য্যাতন ! তার পিতা মাতা ভাই কেউ দাঁড়াল না তার পেছনে। একটা করুণার বাণী, একটা সহানুভূতির বাণী, একটা ব্যথার নিশ্বাস পেয়ে যায় নাই, কেবল সহস্র দর্শকের ব্যঙ্গ ঘৃণা তিরস্কার, অভিশাপ নিয়ে গেছে, কারাগারে ! তাই, বুঝি তাকে এত ভাল বেসেছি। আমিত ভাল বেসেছি, সে ত জানে না। আমি যে ছিলাম তার সকলের চেয়ে শত্রু, আমি তাকে ভাল বাস্‌ব, হৃদয় দান কর্‌বো, এ বিশ্বাস কি সে মনে আন্‌তে পারে ? কেন আস্‌বে সে এ সংসারে ফিরে ? কার জন্য ? আর যদি না আসে ? তবে এ খেলা এইখানে সাঙ্গ করে আর একটা নতুন খেলায় কি মন দিতে পারি না ?

শৈল কেমন লক্ষ্মী মেয়েটী ! খুব তালিম অভিনেত্রীর মতন ত অভিনয় করে যাচ্ছে, সংসারের অভিনয়। এ সংসারে হৃদয়ের অনুমতি নিয়ে কাজ করা বড়ই কঠোর, অসম্ভব বলেই বোধ হয়। হৃদয়ের সাথে

যোগ রেখে কাজ করা চলে বনে, লোকালয়ে নয়, সমাজে নয়! স্ত্রী পুরুষ কেউ পারে না!

লুব্ধ ব্যক্তি লোভের সামগ্রীর অনুসরণ করিতে পথে খুব দ্রুতই চলে। তখন ভাবে না, পাই কি না পাই, কিন্তু যখন তার গন্তব্য পথের সীমা দেখা যায়, যখন প্রারব্ধ কর্ম্মের শেষ হ'য়ে আসে, তখন উৎসাহ দমে আসে, তখনই মনে হয় হয়ত কাম্য লাভ নাও হ'তে পারে। এত শ্রমের পর এ চিন্তাটায় হৃদয় নুয়ে আস্‌তে চায়। প্রখরা মৃণালিনী, বড় শান্ত, যেন নিভে আস্‌ছে।

ক্ষেমী এসে বলিল, "ডিউটিতে যাবে না দিদি ;"

"না, মেম সাহেবকে বলে আয়, আমার অসুখ করেছে।"

"মেম সাহেব রাগ কর্‌বে না ?"

"বয়ে গেল!"

ক্ষেমী সেরেছে। সে এখন হাস পাতালের দাসী! মৃণালিনী তাকে ছাড়ে নাই। তবে পোড়াকপালী এখন আবার চাকর বাকর গুলির সাথে ইয়ারকি কর্ত্তে যায়। মৃণালিনী শাসনে রাখে।

২২

শৈল এবার এলাহাবাদ ঘুরিয়া বাড়ী আসিয়াছে। তার স্বামী এখন ভাল পথের অনুসন্ধান পেয়েছেন। ঘর ছেড়ে বিদেশে ঘোরা। তাতেই তার দ্বিতীয় পক্ষ খুসি। এক বছরে প্রায় হাজায় পঞ্চাশেক টাকা উড়ে গেছে। তারপর নতুন অভ্যাস হয়েছে মদ্যপান। যোগ্য পুত্র মণি বিরক্ত ও চিন্তিত হয়েছে। সে ভয় পেয়েছে, এরকম কর্ল্লে

সর্ব্বনাশ হবে, অর্থ সম্পদ সকলই যাবে। এই এক বৎসর বিষয় কর্ম্মে প্রবেশ করে, মণির বিষয় জ্ঞান জন্মেছে, অর্থ সম্পদে টান বেড়েছে।

মণি একদিন শৈলকে গিয়া বলিল, "মা! একি কচ্ছ? সর্ব্বনাশ হয় যে!"

শৈল যেন একটু রুক্ষ হয়েই বলিল "কি?"

"ব্যাঙ্ক থেকে এক বৎসরে পঞ্চাশ হাজার টাকা তোলা হয়েছে।"

"যার টাকা, সেই তুলেছে, চুরিত কেউ করে নাই?"

একি কথা! এমন নিষ্ঠুর কর্কশ ভাষা ত মণি কোনও দিন তার এই ছোট্ট মাটীর মুখে আশা করে নাই। একটু মনোযোগ করিয়া শৈলের মুখের দিক তাকাইয়া দেখিল, সে মুখে যেন কালিমা জড়িয়ে গেছে। তার শরীরও বড় শীর্ণ, বিবর্ণ। মণি ভাবিল, ওঁর শরীর ভাল না, তাই এমন কর্কশ কথা বেরিয়েছে। মণি বলিল, "একি মা? তোমার শরীর যেন বড় খারাপ?"

"খারাপ হবে না? এত বড় আগুনের ভিতর থেকে, আমি মেয়ে, তাই এতদিন টিকে আছি।" শৈলের চ'কে জল আস্‌ছিল। মণি মাথা নিচু করিয়া চলিয়া গেল। আর কথা বলিতে তার সাহস হলো না।

সেই দিনই খুব বড় ডাক্তার আসিলেন। তিনি শৈলকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "এ এক রকম দুরারোগ্য ক্ষয় রোগ, উত্তেজিত মনোবৃত্তি অত্যধিক আবেগে দমন কর্ত্তে গিয়া এই রোগ জন্মে। এতে অনেকেই পাগল হয়, তাতে রোগীর জীবনের আশঙ্কা নাই। আর যাদের মানসিক শক্তি প্রবল, তারা পাগল হয় না; দেহের শোণিত মস্তিষ্কে উঠে উঠে, দেহ-ক্ষয় হয়, তারপর মারা যায়। ডাক্তারিতে একে বলে ম্যানিন্‌জাইটিশ।"

চিকিৎসকের রোগ নির্ণয় শৈল শুনিল না, শৈলের স্বামীও শুনিলেন না। তাঁর এখন শুনিবার মতন সংজ্ঞা প্রায়ই থাকে না। সুরা তাঁকে বড় আরাম দিয়াছে। সুরার অধিকারে থাকলেই তাঁর আর মনে আসে না যে, তিনি বৃদ্ধ, আর তার পত্নী বালিকা! মণি সব শুনিল! ঔষধ আনিয়া বিমাতাকে সেবন করাইল, পরিচারিকাদিগকে সাবধান করিয়া বুঝাইয়া দিল।

মৃণালিনী সংবাদ পাইয়া, সাতদিনের ছুটি লইয়া চলিয়া আসিল। তারও শরীর তত ভাল নয়। এতকালে এত ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে মৃণালিনীর দেহের স্বাস্থ্য কখনও টুটে নাই। এই সবে তাকে রোগা দেখাইল, দেহের লাবণ্য শুষ্ক বোধ হইল;

মৃণালিনী শৈলকে দেখিয়া কতক্ষণ দন্তে অধর চেপে দাঁড়াইয়া রহিল। শৈল বলিল, "এসো দিদি বোস!" যেন মামুলি ধরণের সম্ভাষণ মৃণালিনী বলিল, "একি? মরতে যাচ্ছিস্ না কি শৈলি?"

"না, মরতে এরা দেবে না, মস্ত ডাক্তার এনেছে।"

"কি হয়েছে তোর?"

"কি হয়েছে তোর? তুমিও বল, কি হয়েছে তোর।" শৈলবালা যেন গর্জ্জিয়া উঠিল। 'দিদি তুমিও বল কি হয়েছে আমার? আমি তোমায় সকল কথা বলি, তোমার প্রখর বুদ্ধিতে তুমি শৈলের প্রতি রক্ত বিন্দু দেখ্‌তে পাচ্ছনা? রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীরা সপ্তাহে তিন দিন মাত্র ৩।৪ ঘণ্টা অভিনয় করে, তাতেই তাদের হয়রান হতে হয় না? তাতেই সে হতভাগিনীদের কাউকে পঞ্চাশ বৎসর পার হতে বড় দেখা যায় না। আর আমি এই চারিটা বৎসর দিন রাত, নিদ্রা জাগরণে অমন ভাবে অভিনয় করে যাচ্ছি,—আমি যা নই, তাই। উপবাসে থেকে রাণীর অভিনয় করে যাচ্ছি না?

দুর্গন্ধ ন্যাকড়ার উপর রাণীর সাজ পরে বেড়াচ্ছি না? আর যারা অভিনয় দেখে, তারাত জানে না, কত খানি রক্ত চুষে যাচ্ছে অভি-নেত্রীর! তারা দেখে বাহবা দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তুমি,—তুমিও কি তাই? তুমি জান না আমার কি পীড়া? তবে আমাকে ঘর ছেড়ে বিঘরে যেতে এত উৎসাহ দিয়েছিলে কেন? মণিকে বিয়ে দিয়ে বেহাৎ করে দেখ্‌তে তোমার এত জবরদস্তি কেন?"

শৈলর মুখ সান্ধ্য গগনের চেয়ে সিন্দুর-মাখা হয়ে উঠেছিল। মৃণালিনী হাত ধরে তাকে বসাইল, পাখা নিয়ে বাতাস করিল, মাথায় জল বরফ দিল। সেই সময়ে শৈলের স্বামী সেখানে এসে উপস্থিত, তখনও তাঁর মত্ত অবস্থা। এসেই তিনি বল্লেন, "আহা থাম্‌লে কেন? তোমরা দুই বোন থিয়েটার কচ্ছ, বড় সুন্দর শুনছিলাম, তাই দেখতে এলাম।"

শৈল তার লাল মুখে লাল চোখে তর্জ্জন করিয়া বলিল, "দূরে যাও মুখ পোড়া।"

বৃদ্ধ যেন অপরাধীর মতন বলিলেন "এই! এই রকমই ত। এমনি করে যদি কথা কইতে, তবে কি আমার প্রাণের আক্ষেপ থাকৃত! আর কোনও দিনত এমন শুনি নাই।"

শৈল সেখান থেকে উঠে গিয়ে, মৃণালিনীকে ডেকে দুয়ার বন্ধ করিল। মৃণালিনী বলিল, "আমি তোকে বিদেশে থাকৃতে পরামর্শ দিয়েই কি, মরণের পথে এগিয়ে দিলাম।"

"অনেকটা সে রকমই বটে, তা সে একটা মন্দ কিছু কর নাই। জীবের মরণ যখন নিশ্চিত, তখন একজন আর এক জনের মরণে সাহায্য করলে তার অপকর্ম্ম করা হয় না। রাজার আইনে নরহত্যাকারীর অপরাধ এত বেশী কেন বল্‌তে পারি না। সে থাক, মণির বিয়ের

জন্য চেষ্টা কচ্ছি। মিনসের ত অবস্থা দেখ্‌লে। এখন যা হয়. যত সত্বর হয় ভাল। তোমার দু'বছরের কত বাকি, তাত জিজ্ঞাসা করলাম না। তা জিজ্ঞাসায়ই বা আমার আর কি প্রয়োজন?

২৩

মণির বিবাহ হইয়া গেল। যথা সম্ভব আড়ম্বরে শুভকার্য্য সম্পন্ন হইল। মৃণালিনী কর্ত্রী হইয়া উৎসব আমোদ পান ভোজনের ব্যবস্থা করিল। আত্মীয় কুটুম্ব স্বজন বান্ধব অনেক আসিল। কুটুম্বিনী যারা এসেছিলেন, তাঁরা নূতন গিন্নীর এই বোনটার সকল বিষয়ে গিন্নীপনাটা একটু জ্বালার সঙ্গেই সয়ে নিলেন। লোকটার গুণ আছে, খাটুনিতে পিছায় না। তবে বড়. খরখরে রূপ আছে বটে, তবে বড় প্রখর। বুদ্ধি আছে বটে, তবে বড় আপনঃ-বোধা, মাগী সরম করে না কাউকে, ভরম রাখে না কারুই। কর্ত্তা গিন্নী যেন এর কাছে যোড়হাত মণিত মাসীমা বলতেই অজ্ঞান। খাটি মাসী মামী যারা এসেছিলেন, তারা বলাবলি করিলেন, বুড় বয়সে কচি গিন্নী আনলে এমনই হয়। ওত খুটার জোরে মেড়ার কোঁদুনি যেখানে দু'জন একত্র হতে পেরেছে সেইখানেই মৃণালিনীর সমালোচনা।

শৈলও এক'দিন তার ভাঙ্গা দেহ-রথখানা খুব জোরে চালিয়ে চলিল। বুড়োকে আগে থাকৃতেই বলিল, "সাবধান, এ ক'দিন মদ খাবেত. আমি বাড়ী ছেড়ে চলে যাব।"

এই ধমকেই বুড়োর নেশা জমে গেল! একটা ঘরে অসাড় হয়ে পড়ে থাকলেন! সর্ব্বনাশিনী শৈল! আগে থেকে যদি তুমি বৃদ্ধকে এমনি ধমক চমক দিতে, এমনি অবহেলায় সাহসে তাকে শাসনে আন্‌তে তবে কি বৃদ্ধ বয়সে ওনি এমনি ভাবে মাতাল হয়ে, দশের হাস্যাস্পদ হতেন? তুমি তাঁকে যতই কৃত্রিম হৃদয় নিয়ে সেবা যত্ন দিয়ে মুগ্ধ কর্ত্তে গিয়েছ, ততই তাঁর প্রাণ আতঙ্কে কেঁপে উঠেছে! তুমি ভেবেছ, রমণীর কর্ত্তব্য পালন করে তুমি পুণ্য সঞ্চয় কচ্ছ, কিন্তু কপটতায় পুণ্য হয় না। মনের আগুণ তীর্থের জলে নেবে না।

বর বউ আসিল। বউ বরণ করে শৈল ঘরে তুলিল! তারপর কোথায় শৈল? শৈল শয্যা লইয়াছে, আর চলে না! মৃণালিনী গিয়া বলিল, "এ কি?" শৈল বলিল, "চুপ্ সোর গোল করো না, আমি একটু জিরিয়ে নি।"

ফুলশয্যা হইয়া গেল। বর-বধূ আবার যোড়ে শ্বশুর বাড়ী গেলেন। সেইদিন রাত্রিতে শৈলের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন! মৃণালিনী শৈলের মাথায় হাত দিয়া বলিল, "চল্লি নাকি শৈল!"

"হ্যাঁ দিদি যাই! আমার যেতেই হবে। মৃণালিনী! বুড়োকে ডাক। তাকে এনে এ ঘরের দোরটা দে। অনেক কথা বল্‌বার আছে। কেবল তোমাকে,—আর সেই হতভাগ্যকে।"

মৃণালিনী শৈলের স্বামীকে ডেকে আনিল। শৈল তার হাত ধরে কাছে বসাল! তারপর ধীরে ধীরে বল্‌তে লাগ্‌ল "শোন তোমরা দুজনে শোন, কিন্তু সহস্র নারীহত্যার পাতক হবে, এই কথা যদি আর কারু কাছে বলো। এই বাড়ী যখন প্রথম দিন পদার্পণ কর্ল্লাম, নিরীহ বলির ছাগের মতন, শূন্য উদাস প্রাণে, তখন একটী আঠার বছরের মদনমোহন

কিশোর মূর্ত্তির উপর আমার দৃষ্টি পড়্‌লো! সে মণি, আমার সতীন পুত্র! সেই মুহূর্ত্তেই আমার মনে সাড়া দিয়ে উঠ্‌লো, আমি মণিরই যোগ্যা, এ বৃদ্ধের যোগ্যা নই। তার পর কি লড়াই চলেছে আমার কাছে বুকে এই চার বৎসর! দুরন্ত ছেলে মণি, কত ভক্তি, কত প্রীতি দিয়ে আমায় প্রসন্ন কর্ত্তে গিয়েছে, কত আকুল পিয়াসে সে আমায় চেয়েছে, মায়ের স্নেহ! দিনে শত বার সে আমায় মা বলে ডেকেছে! আমি একবারও তার ডাক শুনি নাই। তাকে যত্ন করেছি, আদর করেছি, মায়ের হৃদয় নিয়ে নয়,—আর একটা পাপের সজ্জা লুকিয়ে রেখে, তার সাথে মায়ের অভিনয় করে গেছি। কত রাত্রি আমি ঘুমন্ত মণির শয্যা পার্শ্বেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার নিশ্বাস গণেছি! কত দিন, কত ছলে, তার পরশ গায়ে লাগিয়ে এসেছি! কত দিন আমার অধর কেঁপে উঠেছে, তার ছোট একটু পরশের আশায়! এই যে প্রলয়ের বন্যার মতন কামনার স্রোতটা আমার বুক ভেঙ্গে অহর্নিশ উঠ্‌তে চাইতেছিল, তা আমি দমিয়ে ঠাসিয়ে রেখেছি, কত বলে, কত হাড় ভাঙ্গা চেষ্টায়, বুঝ্‌বে কি তোমরা? মৃণালিনীর পরামর্শে বিদেশে, কত পাহাড় নদী পার হয়ে আড়ালে গিয়াছিলাম, তাকে ভুল্‌তে, অন্তর হতে তার রূপের ছায়া মুছে ফেল্‌তে;—পারি নাই তা। তার পর তোমাদের উপদেশ, তাকে বিয়ে দিয়ে, পরের হাতে বেহাৎ করে, আপনার দাবীটা উঠিয়ে নেব ভেবেছিলাম, তা করেছি, কিন্তু এ দাবী তোলা যায় না। আমার মণি এসেছে বউএর হাতধরে সলজ্জ হাসিমুখে, আমি কি সত্যই তার মা যে, আহ্লাদে বউএর মুখ চুমো খাব? কত মাও যে বউএর হাতে ছেলে সঁপে দিতে ব্যথা পায়! মণিকে পাব না তা আমি জানি, মণিকে পাওয়ার চেষ্টা করাও আমার বিষম বিদ্রোহ, ঘোরতর পাপ। কিন্তু কোন্ পাপে মণি আমার হলো না, মণিকে পেলাম না, তাত বুঝ্‌লাম না! আমার বাবার

যদি টাকা থাক্‌ত, তবে মণি আমার হতে পার্ত্ত না? সমাজ পুরুষের গড়া, নারীর রক্ত দিয়ে!"

শৈলের কণ্ঠস্বর অবসন্ন হইয়া আসিল। একটু বিশ্রাম করিল, একটু জলপান করিল; তারপর আবার বলিল, "আর তুমি হতভাগ্য বৃদ্ধ? বড় দয়ার পাত্র তুমি! আমি প্রাণান্ত সংগ্রাম করেছি, তোমাকে তোমার কাম্য বস্তু দিতে, পারি নাই। তোমার পাপ আমি ক্ষমা করে যাচ্ছি, আমার পাপ তুমি ক্ষমা করো! আমার বড় ভাগ্য যে এ সময়ে যমরাজ আমায় যেচে দয়া কর্ল্লেন, নইলে আত্মহত্যার পাপ আমাকে নিয়ে মর্‌তে হতো। আমি মরিলাম মণির মঙ্গলের জন্য! আমি থাক্‌লে তার সংসারে বিষ থেকে যেত। আমি তাকে সাম্‌লিয়ে চল্‌তে পারতাম না।"

শৈল আবার থামিল, আর যেন কথা ফোটে না। আর একটু সরবৎ খাইল! তারপর অতি কষ্টে বলিতে লাগিল, "দিদি! মাকে বলো, আমি টাকার গদিতে শুয়েছি, হীরা মণি পরেছি, ক্ষীরমণ্ডা খেয়েছি! কত সুখে কাটিয়ে আজ চলে যাচ্ছি,! আর—আর, মণির হাত দিয়ে,—মণির হাত দিয়ে, তোমরা আমার মুখে আগুন দিও না। আমি মণির মা, একথা যেন পরকাল—পরকাল পর্য্যন্ত পৌঁছায় না।"

শৈলর কথা অস্পষ্ট হইয়া গেল। তখন এদের হুস্‌ হইল, ডাক্তার ডাক্‌তে! বৃদ্ধ তেমনি বসিয়া রহিলেন। মৃণালিনী খানিকক্ষণ ছুটাছুটি করিল! ডাক্তার আসিবার আগেই শৈল চিকিৎসার অতীত রাজ্যে চলিয়া গেল।

মৃণালিনী পাষাণী, কাঁদিল না। তার এত বড় নির্ভরের স্থান, আজন্ম স্নেহের পুতুলটী চূর্ণ হইয়া গেল! মৃণালিনী নির্জ্জল নেত্রে চাহিয়া রহিল, মৃতার বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখের পানে! তারপর বুক ভাঙ্গা নিশ্বাস

ছাড়িয়া বলিল, "এত রূপ নিয়ে এসেছিলি অভাগিনী, এই নির্দ্দয় রাজ্যে? হৃদয়টা এত বড় শক্ত করে গড়েছিলি! এর কি কেউ পুরস্কার—বিধাত নাই?"

---

(২৪)

শৈলবালার শব যখন শ্মশানে নিয়ে গেল তখন, শ্মশানযাত্রীরা ফিরিয়া আসিবার আগেই মৃণালিনী সেখান হইতে প্রস্থান করিল। এবার ত কারু কাছে বিদায় লইতে তার সময় নষ্ট করিতে হইল না!

এইবার মৃণালিনী কাঁদিল। রাস্তায় নামিয়া তার চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া গেল। এবার ত সে গাড়িতে যাইতেছে না, তার জন্য কেউ গাড়ী আনিয়ে দেয় নাই, কেউ ত আদর করে তার হাতে টাকা গুঁজে দেয় নাই? সংসারে এমন আর কেউ থাকিল না যার কাছে সে মনের ভার নামাতে পারে? মৃণালিনী চ'কের জলে পথ দেখিতে পাইতেছে না! আরত সে আঁসিতে পাইবে না বোনের বাড়ী! কাঁদিলে কি কান্না ফুরায়? শৈল! শৈলবালা! আমার খেলার সাথী! প্রাণের বোন্! এমনি করে তুই সংসার থেকে মুছে গেলি!"

হাসপাতালে সেদিন কতকগুলি নূতন রোগী এসেছে, বড় সঙ্কটাপন্ন। তাহাদের শুশ্রূষার জন্য রাত্রিতে বিশেষ বিজ্ঞ ধাইএর আবশ্যক। ওয়ার্ডের কর্ত্তা মৃণালিনীকে সেখানে ডিউটিতে দিলেন। মৃণালিনীর আজ ডিউটি করিবার অবস্থা নয়। একবার ভাবিল কাজ কি আর দাসীগিরিতে? কিন্তু ছেড়ে যাইবা কোথায়? কেন আমাদের বাড়ীতে? সে যে এখন আমার বাড়ী। এখন আমি সে বাড়ী একা থাকিতে পারি, এখন আর

সমাজ বা কলঙ্কের ভয়ও করি না। তবে যদি ফিরে আসে সে ডাকাত? সংসারটায় যেখানে যেরূপ সম্বন্ধ পাতিয়েছিলাম, সবত একরূপ ছিঁড়ে গেছে! এটা একবার না দেখে যাব না।

মৃণালিনী চোক মুখ ধুইয়া, পোষাক বদলাইয়া রোগীর ঘরে গেল! তখন রাত্রি দশটা, অনেক রোগী ঘুমাইয়াছে, যার ঘুম আসেনা সে কাতরাইতেছে! একজন যতদূর পারে ক্ষীণ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিতেছে, ওগো "বাতাস দাও, হাওয়া কর! জ্বালা! জ্বলে গেল, বড় জ্বালা।"

রোগীর সে বিকৃত কণ্ঠস্বরও যেন মৃণালিনীর চেনা! রোগবিবর্ণ মূর্ত্তিখানাও যেন চেনা! তারপর টিকিটে নাম পড়িয়া আর কোনও সন্দেহ রহিল না! মৃণালিনীর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল! পাখা তুলিয়া হাওয়া করিল! রোগী তবু বলে, "জোরে, জোরে হাওয়া কর! বড় জ্বালা!" মৃণালিনী পাখা ফেলিয়া জড়াইয়া ধরিল! স্পষ্ট বিজলী দ্বীপ জ্বলিতেছে! যতজন রোগী সজাগ থাকিয়া চাহিয়া আছে। মৃণালিনী গ্রাহ্য করিল না, সেই জীর্ণ, অস্থিচর্ম্মসার মরণ-পথ-যাত্রী রোগীকে বাহুবেষ্টনে বদ্ধ করিয়া, অধরে অধর স্পর্শ করিল। রোগী উঠিয়া বসিল! "কে তুমি? মৃণালিনী!" বলিয়া রোগী আবার শুইয়া পড়িল। মৃণালিনী আবার হাওয়া করিল। রোগী ধীরে বলিল, "আর না, জুড়িয়েছে! মৃণালিনী তুমি এখানে কেন?"

মৃণালিনী স্পষ্ট কণ্ঠে বলিল, "তুমি সকল নিয়েছ, একটী জিনিস নিতে পার নাই, তাই দিতে এসেছি।" মৃণালিনী হাতের অঙ্গুরীয়টী রোগীর অস্থিচর্ম্মসার অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিল!"

"কি করলে মৃণালিনী! আমি যে মরতে যাচ্ছি!"

"তার আর উপায় কি? আমার আর কেউ নাই।"

রোগী উপুড় হইয়া শুইয়া চক্ষের জলে উপাধান ভিজাইল ! তার বড় জোরে কাশি আসিল ! অনেক রক্ত পড়িল ! মৃণালিনী বুঝিল সকলই ! এমনটা সে অনেকদিনই কল্পনা করেছিল ! এইত বিধাতার নিয়ম !

নলিনীরঞ্জন একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, "মৃণালিনী ! আমার যে বাঁচ্‌তে বড় সাধ হচ্ছে ! কি সঞ্জীবনী সুধা তোমার অধরে ! কি মধুস্পর্শ তোমার অঙ্গে ! মৃণালিনি ! প্রিয়তমে ! আমায় কি বাঁচাতে পার্‌বে ?"

"আমি কাউকে বাঁচাতে পারি নাই, তুমিও বাঁচবে না। অন্ততঃ দুটী দিন তুমি বেঁচে যাও, আমি প্রাণ ভরে তোমার সেবা করি !"

তপন ভার প্রাপ্ত ডাক্তার এসে রুষ্টস্বরে বলিল, "ধাত্রি ! তুমি রোগীর সঙ্গে একি ব্যবহার কচ্ছ ?"

মৃণালিনী কিছুমাত্র লজ্জিত বা শঙ্কিত না হইয়া বলিল, "রোগী নয়, আমার স্বামী।"

"তোমার স্বামী ? একে আজ জেল থেকে মুক্ত করে হাসপাতালে দিয়ে গেছে !"

"তাত বুঝ্‌তে পেরেছি, জেলের কর্ত্তারা একটা শব-বহন ক্লেশ থেকে উদ্ধার পেয়েছেন।"

"তোমার স্বামী ?"

"হ্যাঁ।"

"কেমন স্বামী ?"

"তুমি সাহেব, তুমিত জান না হিন্দু রমণীর স্বামী কেমন থাকে ? ইনি আমার তেমনি স্বামী, যাঁর সঙ্গে আমার ইহ-পরকাল জড়িত। সাহেব, অন্য ধাত্রী ডাক, আমি অন্য কোনও রোগীর সেবা আজ করবো না। এ চাকরীও আমি আর করবো না।"

মৃণালিনীর শেষ প্রার্থনাটী ভগবান রক্ষা করিলেন। নলিনীরঞ্জন আরও দু'দিন বাঁচিল। মৃণালিনী প্রাণপণ চেষ্টায় তার সেবা করিল। নলিনী কতবার মর্ম্ম বিদারিয়া বলিল "আমায় বাঁচাও মিনু! আমি দশটা দিন তোমায় ভোগ করে যাই! কত সুন্দর! কত শীতল তুমি!"

মৃণালিনীও কত কেঁদে বলেছিল, "হে নিষ্ঠুর বিধাতা! এতটুকু দয়া করলেত তোমার বিশ্বসৃষ্টি অশুদ্ধ হয়ে যায় না!"

---

(২৫)

মৃণালিনী এই দুটী দিন ধরিয়া কেবল প্রার্থনা করিতেছে, হে অনন্ত করুণাময় শিব বৈদ্যনাথ! তুমি দয়া করিলে কি না হইতে পারে? আমার মত ক্ষুদ্রের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া তুমি দয়া করিতে পার। আমি এত দিন তোমার কথা মনে করি নাই, তোমার সত্তা আমি অনুভবই করি নাই, আপনার দম্ভে আপনি ফুলিয়াছি! আজত বুঝিতেছি, আমি কত ক্ষুদ্র। আর তুমি কত মহান্! দয়া তোমায় করিতেই হইবে! শাস্তি দিয়া তুমি আমার দম্ভের পাহাড় গলাইয়া দিয়াছ, এখন করুণা আমায় দিতেই হইবে! আমার যে সংসার-সুখ-সাধ কিছুতেই যাইতেছে না প্রভু! স্বামীর গৃহিণী হইয়া সংসার সাজাইবার কামনা আমি ত মুছিয়া ফেলিতে পারিতেছি না। একটী দিনের জন্য,—নেহাৎ পক্ষে

একটী দিনের জন্য আমায় সে সুখ-সাধ মিটাইতে দিতেই হইবে দয়াল।”

মৃণালিনী দুই দিন অনাহারে অনিদ্রায়, জলটুকু পর্য্যন্ত পান না করিয়া, কত কাঁদিয়া কত অশ্রু ঝরাইয়া কেবল প্রার্থনা করিতেছে, অকপট সরল প্রাণে সর্ব্বশক্তিমানের চরণতলে আপনাকে সমর্পণ করিয়া দিয়াছে।

এখন আর সে হাসপাতালের ধাত্রী নাই। সে চাকরী হইতে সে নাম কাটাইয়াছে। তথাপি সে সর্ব্বদা রোগীর শয্যায় বসিয়া থাকে, সে রূপ থাকা বে-আইনি, মৃণালিনী তা মানে না। কর্ত্তারা তাকে গাল দিয়াছেন, জোর করিয়া রোগীর ঘর হইতে বাহির করিবার হুকুম দিয়াছেন, মৃণালিনী কিছুই মানে নাই। তার এত নির্ব্বন্ধ দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষেরাও অগত্যা শান্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের আদেশ হইয়াছে এ রোগী যখন বাঁচিবেই না, তখন ইহাকে হাসপাতাল থেকে সরাইয়া দেওয়া হউক।

তাহাই হইল। মৃণালিনী তাহাতেই সম্মত। মৃণালিনী মণিকে ডাকাইয়া বলিল, “বাবা! তোমার এতবড় বাড়ীর মধ্যে একটী ঘরে দশটী দিনের জন্য, আমার রুগ্ন স্বামীকে নিয়ে থাক্‌তে দিতে হবে।”

মৃণালিনীর চোক মুখের অস্বাভাবিক ভাব দেখিয়া মণির ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। মৃণালিনীর স্বামী কোথা হইতে আসিলেন, এ কৌতূহল তার বুক ফেটে উঠিতেছিল, কিন্তু মৃণালিনী কথা বলিতে সময় দিল না। তখনই গাড়ী ডাকিয়া রোগীকে গাড়ীতে তুলিয়া, গাড়ী ছাড়িতে হুকুম করিল। এ ক’টা কাজ সে এত দ্রুত করিল যে, তাহাতে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিবার বা একটু ভাবিয়া

চিন্তিয়া দেখিবার অবকাশই মণি পাইল না। মণি তখন মা-মরা ছেলে, বড় শোকার্ত্ত। মৃণালিনী গাড়ি হাকাইয়া চলিয়া গেল, মণি সেখানে দাঁড়াইয়া ঘণ্টা খানেক ভাবিল, আশ্চর্য্য এই রমণীর কার্য্য কলাপ!

তারপর মণি বাড়ীতে গিয়া দেখিল তাহার বাড়ীতে বাহিরের একটা নীচের ঘরে মৃণালিনী রোগীর শয্যা করিয়া দিয়া নিকটে বসিয়া বাতাস করিতেছে। মণি বলিল, "এঁর চিকিৎসার কি ব্যবস্থা হবে মাসিমা?"

"কিছুই না, চিকিৎসকের ওষুধ আমরা খাই না, আমরা হরিবোলা।" মণিও বুঝিল, তাই বটে, এ রোগীর চিকিৎসা নিস্প্রয়োজন। ব্যাপারটার ভিতর জানিবার জন্য বাড়ীর আর পাঁচ জন মণিকে চাপিয়া ধরিল। মণি বলিল, "সে সব এখন না, পরে শুনবে।" এই বলা ছাড়া তার আর কিই বা বলিবার আছে?

বুঝি দয়াময়ের দয়া হইল। নলিনীরঞ্জন একটু একটু সুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন। তিন দিন পরে মৃণালিনী দুধ জাল দিয়া চরুর মতন একটা কিছু নিজে রাঁধিল। সে যে এ কয় দিন খায় না, আজ খাইবে। যেন খাইবার জন্য তার প্রতি দয়াময়ের আদেশ হইয়াছে। চরু রাঁধিয়া সে কলা পাতায় ঢালিয়া, নলিনীর সম্মুখে দিয়া বলিল, খাও, "ঠাকুরের প্রসাদ।" নলিনী খাইল, নিতান্ত অরুচি তার, কিছুই খাইতে পারে না, আজ এ শুধু দুধ ভাত খুব অনেকটা খাইল। মৃণালিনী বলিল, "না, না আর খেয়ো না, আমি যে প্রসাদ পাব। সব তুমি একা খাবে।" অবশিষ্ট যাহা ছিল মৃণালিনী খাইল। এ কদিন মৃণালিনী আর কাহারও সঙ্গে কথাটীও বলে না। যাহা যখন প্রয়োজন হয়, নিজ হাতে করে। নিজে ছুটিয়া গিয়া আনে, কারু কাছে কিছু চায় না। মণি রোগীর পথ্যের জন্য অনেক সুখাদ্য

দ্রব্যাদি আনিয়া দিয়াছে। মৃণালিনী তাহাতে কোনও কথাই বলে নাই। কিন্তু রোগীকে দুধ ভাত ছাড়া কিছুই খাইতে দেয় না।

দিন দশেকের মধ্যে রোগী বেশ সবল হইয়া উঠিল। এখন সে ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দু'পা চলিতে পারে। নলিনী বলিল, "মিনু? বাঁচলাম না কি?"

মিনু বলিল, "নিশ্চয়ই।"

দশ দিন পরে বলদেব আসিয়া উপস্থিত। বলদেবকে দেখিবামাত্র মৃণালিনী ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তাহার দুই গণ্ড বাহিয়া ধারা গড়াইয়া গেল। এই নিখিল পৃথিবীটার মধ্যে তাহার জন্য, শত অপ-রাধেও বলদেব জ্যাঠার মতন এমন স্নেহের বুক পাতিয়া দিবার জন আর কেহ নাই। এত দুরন্তপণায়ও বলদেব জ্যাঠা স্নেহ ভুলিতে পারেন নাই। মৃণালিনী তাহাকে পত্র দিয়াছিল, পত্র পাইবামাত্র ছুটিয়া আসিয়াছেন। আগেকার সেই অবাধ্যতা একটুও মনে করেন নাই। মৃণালিনীর বুক ফাটিয়া কান্না আসিল, চোক ফুটিয়া ধারা বহিল। হা ভগবান কত স্নেহ তোমার এ দুরন্ত মেয়েটার উপর। তার জন্য তুমি এমন স্নেহের পাহাড় গড়িয়া দিয়াছ, সে ত কোনও অবজ্ঞা অবহেলায় টলে না। কেবলই তার জীবন ক্ষেত্রের উপর স্নেহের ধারা ঢালিতেছে। যদি কোনও দিন এ স্নেহ সুধায় তার উষর জীবন উর্ব্বর হয়ে ওঠে।

বলদেব আদরে মৃণালিনীর হাত ধরিয়া চক্ষু মুছাইয়া দিলেন। আজ কত কাল পরে মৃণালিনীকে দেখিয়া তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। তিনি করুণা বিকল কণ্ঠেই বলিলেন, "কেন মা। কাঁদছিস কেন। আমায় যেমন ডেকেছিস, তেমনিইত এসেছি।"

"আমায় ত্যাগ কর নাই জ্যাঠা মশাই।"

"কেনরে পাগলি, তোমায় ত্যাগ করবো কেন। যে দিন ভগবান

তোমার ভাবনা ছাড়িয়ে ডেকে নেবেন, সেই দিন তোমায় ত্যাগ করে যেতে হবে। এর আগেত পারব না মা।"

মৃণালিনী অনেকক্ষণের চেষ্টায় আপনাকে সামলাইয়া লইল। তার পর বলদেবের হস্তপদ প্রক্ষালনের জল দিল, তার প্রয়োজনীয় শুশ্রূষাদি করিল। তাঁহাকে একটু জলযোগও করাইল। নলিনী এতক্ষণ বাহিরে বেড়াইতেছিল। এক্ষণে বাড়ীতে প্রবেশ করিল। মৃণালিনী সরিয়া একপাশে গিয়া দাঁড়াইল। বলদেব যেন বিস্মিত হইয়াই বলিলেন, "এ কে? সেই না?"

মৃণালিনী আস্তে বলিল "হ্যাঁ!"

কি একটা বড় সমস্যার সমাধান হইল বলিয়া বলদেবের মুখে যেন একটা স্বস্তির চিহ্ন দেখা গেল। বলদেব একটু ভাবিয়া বলিলেন, "আমায় এত বড় জরুরি সংবাদ দিয়ে এনেছ কেন মা?"

মৃণালিনী বলদেবের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। অনেক চেষ্টা করিয়া অনেক বল পূর্ব্বকই যেন তাকে কথা বলিতে হইল। "জ্যাঠা মশাই, আমার বিবাহ হয় নাই, আমাকে আমার স্বামীর হাতে শাস্ত্রমত সম্প্রদান কর্ত্তে হবে আপনারই।" আর কিছু বলিতে পারিল না যেন এতবড় আবেগে তার প্রাণশক্তি স্তম্ভিত হইয়া গেল, মৃণালিনী নীরবে নিস্পন্দে বসিয়া রহিল।

বলদেব প্রফুল্ল চিত্তে বলিলেন, "তাই হবে। আমি তোমার সগোত্র নই, তবু আমি তোমার সম্প্রদাতা হবার অযোগ্য নই। এই কর্ম্মটা করিতে পারিলে আমারও যেন বড় একটা কর্ত্তব্য পালন হয়।"

বলদেব সমস্ত জানিয়া শুনিয়া লইলেন। নলিনীকে দেখিয়া পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, এ যে নলিনীর মরণ ব্যাধি। এ রোগত কখনও নিরাময় হইতে পারে না। রোগীর মানসিক অবস্থার আকস্মিক পরিবর্ত্তনে, রোগের একটু উপশম দেখাইতেছে বটে, কিন্তু রোগীর রক্ত মজ্জা অস্থি পর্য্যন্ত ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। এমন ভগ্ন দেহেত জীবনী শক্তি ফিরিয়া আসিতে পারে না।

বলদেব মৃণালিনীকে নিভৃতে ডাকিয়া বিষয়টা ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন। মৃণালিনী অতি মৃদু একটু হাসিয়া বলিল, "তার আর এখন কর্‌বার কি আছে?" আর কিছু না বলিয়াই মৃণালিনী চলিয়া গেল। বলদেব বুঝিলেন, "তাই ঠিক, আর কিবা করার আছে?"

বলদেব মণির বাবাকে ডাকিয়া সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। তিনি কোনও সদুত্তর দিলেন না। আজ কাল তিনি কোনও কাজেই মন দেন না। শৈলর শ্মশান-যাত্রার পর তিনি তার সহজ জ্ঞানে প্রায়ই থাকেন না, সর্ব্বদাই নেশায় বিভোর থাকিয়াই স্মৃতির দংশন হইতে বাঁচিয়া আছেন। বলদেবের কোনও কথাই যেন বুঝিলেন না। তার পর বলিলেন মণিকে। মণি সকল বুঝিল, তার আগের দিনই মণি বিমাতার শ্রাদ্ধের বৃষোৎসর্গ করিয়া আসিয়াছে। ভাবিল, এও একটা চমৎকার ব্যাপার! একটা চিরদুঃখিনী বালিকার শ্রাদ্ধ করিতে হইল আমাকে! আর মৃণালিনী এই সর্ব্বজন-ত্যক্ত-পতিত পাপী মুমূর্ষু যুবকের শ্রাদ্ধের অধিকারী হইতে এমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ! তাহাই হউক।

মণি সে বিবাহের বেশ আয়োজন করিল। মৃণালিনীর সম্মতি লইয়া সে মৃণালিনীর দুই ভাইকে সপরিবারে নিজগৃহে আনাইল। মৃণালিনীর ছোট দাদার সহবাসী সকলকেই নিমন্ত্রণ করিল। সেই উকিল, উকিল গৃহিণীও আসিলেন। ক্ষেমীও আসিল। আজ শৈল নাই, মৃণালিনীর হৃদয়ের সে ব্যথাটা কেউ জুড়াইতে পারে না। মৃণালিনী বড় বিশ্বাসেই সান্ত্বনা লইল, শৈল স্বর্গে থেকে, নিশ্চয়ই তার বিয়ে দেখ্‌ছে। পরকালে এখন তার বড় আস্থা।

নলিনীরঞ্জনের বাড়ীতেও বলদেব সংবাদ করিলেন। শুনিলেন, নলিনীর পিতা মাতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। দুই ভাই দুই স্থানে চাকরী করেন। তাহারা খবর পাইয়াও আসিলেন না। নলিনীর সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা তাহাদের প্রয়োজন ছিল না।

বিবাহ হইয়া গেল। বলদেবই সম্প্রদান করিলেন। মৃণালিনীর ভাই দিগকে করিতে দিলেন না।

দু'দিন আমোদ উৎসবে কাটিয়া গেলে বলদেব বলিলেন, "মৃণালিনী এখন চল তোমাদের বাড়ীতে। স্বামী স্ত্রীতে সেইখানেই থাকিবে।"

মৃণালিনীও বলিল, "তাই জ্যাঠা মশাই! বাবার বাস্তুতেই থাকিব। আপনি যান। আমরা তিন মাস পরে যাইব! আর একবার আমার অবাধ্যতা ক্ষমা করুন জ্যাঠা মশাই।"

মৃণালিনী বলদেবের পা জড়াইয়া ধরিল।

বলদেব বলিলেন, "আবার কি?"

মৃণালিনী বলিল, "আমি আপনার জামাইকে বাঁচাবার চেষ্টা করিব। আমাদের এই দেশেই ত সাবিত্রী সতী মরা স্বামী ফিরিয়ে পেয়েছিলেন। আমি তেমনি একটা চেষ্টা করিব। যদি পারি তবে স্বামী সঙ্গে, বাপ মার পায়ের ধূলার পবিত্র সেই পুরাণ বাড়ীতে গিয়া বাস করিব। নচেৎ

ইহ সংসারে আমার কোনও স্থানের প্রয়োজন নাই। এই অবাধ্যতা টুকু আমায় করিতে দিন জ্যাঠা মশাই।"

বলদেব আপত্তি করিলেন না। মৃণালিনীর কথাগুলি তার কাছে অতি সঙ্গতই বলিয়া বোধ হইল। তিনি তৃতীয় দিবসে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ দিবসে মৃণালিনী স্বামীর সঙ্গে মণির বাড়ী ছাড়িয়া যাত্রা করিল।

---

(২৭)

শৈলর দেওয়া ও মৃণালিনীর হাসপাতালের কাজে স্বোপার্জ্জিত কিছু টাকা ছিল। তাহাই সম্বল লইয়া মৃণালিনী রুগ্ন স্বামীকে লইয়া এলাহাবাদে ত্রিবেণী সঙ্গমতীর্থ প্রয়াগে গিয়া বাসা লইল। কোন দালান কোঠা ভাড়া লইল না। সহর ছাড়িয়া গঙ্গার কূলে একটা বৃক্ষতল ঝাড়িয়া গোছাইয়া লইয়া সেইখানেই দু'জন মুক্তবাতাসে দিন যাপন করিতে লাগিল। প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করে, নিয়মিত কালে ভগবানের উপাসনা করে, নিরামিষ ভোজন করে। মৃণালিনীর অদম্য বিশ্বাস স্বামীর পীড়া দয়াল ভগবান নারায়ণ সারিয়া দিতেছেন। নলিনীরঞ্জনের অকাট্য ধারণা, সাধ্বী পত্নীর সাধনায় তাঁহার পীড়া সারিয়া যাইতেছে।

এমনি করিয়া তিন মাসেই নলিনীরঞ্জন সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইলেন।

তাঁহার যৌবন শ্রী মধুর লাবণ্য ফিরিয়া আসিল! মৃণালিনীর আনন্দ হৃদয়ে ধরে না! সে আনন্দে মিশান মধুর ভগবদ্ প্রেম!

তিনমাস পরেই মৃণালিনী স্বামী সঙ্গে গিয়া বলদেব জ্যাঠা মশাইকে প্রণাম করিল!

বলদেব যেমন বিস্মিত হইলেন, তেমনি আনন্দিতও হইলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, একনিষ্ঠ সাধনায় অসাধ্যও সিদ্ধ হইতে পারে। তপঃ প্রভাবে এখনও মানুষ দৈবশক্তি আয়ত্ত করিতে পারে। কিন্তু সে সাধনাশক্তি মানুষের বীর্য্যের উপর নির্ভর করে। সে বীরত্ব বর্ত্তমানে ভারতবাসীর আছে বলিয়া বিশ্বাস ছিল না। আজ সেই একনিষ্ঠ সাধনায় সত্যশক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি পুলকিত হইলেন। এখনও ভারতবাসী নরনারী তারকেশ্বর, বৈদ্যনাথ, কামাখ্যা, বিশ্বনাথের দ্বারে কামনা সিদ্ধির জন্ম ধর্ণা দিয়া থাকে, কেহ সিদ্ধি লাভ করে কি না জানি না। কিন্তু ভারতীয় নরনারীর এই দৈবের উপর আস্থা নিতান্ত ভিত্তিহীন নয়। তবে দুর্ব্বলের সাধ্য নাই এই দৈবকৃপা আয়ত্ত করিতে। বালিকা মৃণালিনী সাধনাশক্তিতে এত গরীয়সী! শক্তিশ্বর শঙ্কর কি প্রখরশক্তি এই নারী হৃদয়ে গচ্ছিত রাখিয়াছেন! ভাবিতে ভাবিতে বলদেব পুলকিত হইলেন। পুলক প্রফুল্ল চিত্তে তিনি গাইলেন,—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ"

বলদেব নলিনীরঞ্জনকে ডাকিলেন, তাহাকে নিভৃতে নিয়া বলিলেন, "বাবা এখন তোমার কর্ত্তব্য কি স্থির করেছ?"

নলিনী সবিনয়ে বলিল, আপনার কন্যা বলিতে পারেন, আমিত জানি না কিছু।"

বলদেব হাসিয়া বলিলেন, "না না, এরূপ হ'তে পারে না। তোমার

পুরুষ শক্তিটা এত খর্ব্ব হ'তে দিও না। একটা সাময়িক উত্তেজনায় মৃণালিনী আশ্চর্য্য কিছু একটা করেছে বটে, কিন্তু সংসার ক্ষেত্রে পুরুষ শক্তিরও স্বাধীনতা চাই। মৃণালিনী এখন তোমার গৃহিণীমাত্র, গৃহের বাহিরে তোমায় স্বাধীন শক্তির পরিচয় দিতে হইবে। শুদ্ধ সত্যের উপর তোমার শক্তি প্রতিষ্ঠিত হউক, সে শক্তি হবে স্বাধীন, সরল, সদা কর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর। এইরূপ দুটী কর্ম্মশক্তি মিলিত ক'রে সংসারের কাজে নিয়োগ কর্ত্তে হবে। পুরুষ নারীশক্তির সম্ভ্রম কর্‌বে, কিন্তু আত্মশক্তি বিসর্জ্জন দিয়ে হীন দুর্ব্বল হ'বে কেন? সে যে নিতান্ত অবজ্ঞেয় স্ত্রৈণতা। পূর্ব্বকথা ভুলে যাও, এখন মনে কর তুমি স্বামী, প্রভু, মৃণালিনী তোমার পত্নী দাসী। তুমি গৃহ রচনা কর্‌বে, মৃণালিনী সেই গৃহ সাজাবে। পতি আহরণ করে এনে দেবে, পত্নী তাই বিতরণ করে সংসার পুণ্যময় কর্‌বে। তোমাকে এখন তোমার নিজের স্বাধীন একটী গৃহাশ্রম তৈরি করে নিতে হবে। সেইখানেই তুমি স্বামী হয়ে বাস করবে, মৃণালিনীর পিতৃগৃহে বাস করা তোমার চল্‌বে না। তাতে তোমার স্বাধীনতার খর্ব্বতা আস্‌বে, পত্নীর পিত্রালয়ে বাস কর ব'লে, পরগৃহ বাস জন্য দুর্ব্বলতা এসে তোমার কর্ম্মশক্তি অবসন্ন করে দেবে। আমি তোমাকে বসত বাসের যোগ্য একখণ্ড ভূমি দান কচ্ছি; আমার এ দান দয়ায় নহে, স্নেহে। তুমি আমার বড় স্নেহের পাত্র, পুত্রস্থানীয়। আমার একজন ধনবান ব্যবসায়ী বন্ধু আছেন, তিনি তোমাকে কর্ম্ম দিয়ে উপার্জ্জনের পথে তুলে দেবেন। অর্থ উপার্জ্জন করে, এই ভূমিতে কুটীর হউক, অট্টালিকা হউক, একটী গৃহ নির্ম্মাণ করবে। ততদিন মৃণালিনী তাহার পিতৃগৃহে বা আমার গৃহে বাস করবে। কালই যাত্রা কর্ত্তে হবে, তোমায় কর্ম্মে নিয়োগ করে দিয়ে, আমি অন্য কাজে মন দিব।"

নলিনীরঞ্জনকে লইয়া বলদেব স্থানান্তরে গেলেন। তাহাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া ফিরিয়া আসিলেন, মৃণালিনী বলিল; "এত ব্যস্ত হবার কি দরকার ছিল জ্যাঠা মশাই ?"

বলদেব হাসিয়া বলিলেন, "তোমাকেত আমি এত অহঙ্কারী হয়ে থাকতে দিতে পারি না যে, একটা পুরুষকে চিরদিনই তোমার মুখাপেক্ষী ছোট করে রাখ্বে। আমিও ত পুরুষ, পুরুষের শক্তি নারীর শক্তির কাছে নিতান্ত অবনত হতে দেখ্লে আমার অহঙ্কারে আঘাত লাগে না ? এখন তুমি কি কর্ত্তে চাও ? পিতৃ গৃহটা একবার দেখ্তে যাবে বোধ হয়।"

মৃণালিনী পিতৃগৃহ দেখিতে যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল। বলদেব তাহাকে লইয়া তাহার পিতৃগৃহে গেলেন।

সে একটী বহুদিনের জনশূন্য ভগ্ন জীর্ণ অট্টালিকা। সেই যে ডাকাতেরা তাহার দ্বার জানালা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল, তাহার আর সংস্কার হয় নাই। প্রাঙ্গণে জঙ্গল বেড়িয়াছে. সে বাড়ীতে বহুদিন মনুষ্যের পা পড়ে নাই, একটা ঘরের মধ্য হইতে দুইটা শৃগাল বাহির হয়ে ছুটিয়া গেল। দুইটা পেচক ছিল, মানুষের সমাগম জানিয়া দিবসান্ধ হইয়াও পড়িতে পড়িতে উড়িয়া পলাইল। মৃণালিনী গৃহে প্রবেশ করিতেই সম্মুখে দেখিল তাহার সেই বড় আদরের ক্ষুদ্র শঙ্কর মূর্ত্তিটী ধূলি জড়াইয়া মেজে গড়াইতেছে।

মৃণালিনী অতি যত্নের সামগ্রীটার মতন পুতুলটী তুলিয়া বক্ষে ধারণ করিল। আঁচল দিয়া তাহার পায়ের ধূলি মুছাইয়া দিল। দর দর ধারায় তাহার চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিয়া পুতুলটীকে স্নান করাইয়া দিল। মৃণালিনী বিগ্রহটী বক্ষে আঁকুড়িয়া বলিতে লাগিল, "আমার প্রাণের ঠাকুর বৈদ্যনাথ ! এত অনাদরেও তুমি আমার প্রতি ত রুষ্ট হও নাই

আশুতোষ ? আহা কতদিন বিল্বদলের জলে তোমার স্নান হয় নাই ! কতদিন তুমি একটু চন্দন টিপ পরতে পাও নাই ? ঐ ত বাগানে কত ধূতরার ফুল ফুটে শুকিয়ে যাচ্ছে, কেউ তোমার শিরে একটীও পরিয়ে দেয় নাই ! এই আমি এসেছি ঠাকুর ! আমি যেখানে যাই, যা-ই করি, তোমায় ত ভুলি নাই ঠাকুর ! তুমিও আমায় ভোল নাই বৈদ্যনাথ ! নারীর দেবতা তুমিই শঙ্কর ! তোমারই পূজায় নারীর অধিকার !”

মৃণালিনী পুতুলটী বক্ষে আঁকুয়িয়া পুকুর ঘাটে গেল। পুকুরের জলে নামিয়া আপনিও স্নান করিল, বিগ্রহটীও স্নান করাইল। তাহার পর বিল্বদল ও পুষ্পরাশি আনিয়া পুষ্পপত্রের আসন বিছাইয়া তাহার উপর ঠাকুরটী অধিষ্ঠিত করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগিল। আর ভক্তি গদ গদ তরল কণ্ঠে শঙ্করের স্তবটী গান করিতে লাগিলেন,—“প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্।”

বলদেব দাঁড়াইয়া দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। বুঝিলেন, বালিকা সত্যই শিবসত্তা অনুভব করিতে পারিয়াছে। বলদেব বলিলেন, “এখন কি করবে মা ?”

মৃণালিনী বলিল, “এইখানে স্বামীর সঙ্গে থেকে ঠাকুরের পূজা করবো, আর কি কাজ আছে ?”

“স্বামীর ঘর করবে না ?”

“এই ত স্বামীর ঘর।”

না, স্বামীর ঘরে তোমায় যেতে হ’বে। স্বামীর ঘর না করলে নারীর নারীত্ব পূর্ণ হয় না। নলিনীরঞ্জন গৃহ নির্ম্মাণ কচ্ছেন, সেই ঘরে তোমায় গৃহিণী হতে হবে।”

“আমার এ ঘর বাড়ী ?”

"এ ঘর বাড়ী তোমায় ঠাকুরকে দাও। এইখানেই একটী শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত কর্ত্তে হবে।"

বলদেব ও মৃণালিনী মণিকে সংবাদ করিলেন। সংবাদ পাইবামাত্র মণি আসিল। মৃণালিনী বলিল, "বাবা, তোমাদের অনেক টাকা আছে, আমাকে এখানে একটা শিব মন্দির গড়ে দিতে হবে।" মণি সানন্দে সম্মত হইল।

যথাসম্ভব কারুকার্য্যে সুশোভিত করিয়া একটী শিবমন্দির নির্ম্মিত হইল। তাহাতে সেই প্রস্তরময় ক্ষুদ্র শিবমূর্ত্তিটী প্রতিষ্ঠিত হইল। মৃণালিনী তখন মণিকে বলিল, "তোমার মা শৈলবালার ফটো আছে, তা হ'তে পাথরের মূর্ত্তি আমায় গড়ে দেবে বাবা ?"

মণি উপযুক্ত কারিকরের কাছে গিয়া বিমাতা শৈলবালার একটী প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি গড়িয়া আনিয়া দিল, সে মূর্ত্তিটী ঐ শিবমূর্ত্তিটীর মত ছোট করিতেই মৃণালিনী বলিয়া দিয়াছিল। মৃণালিনী শঙ্করের পাদমূলে সখী শৈলবালার মূর্ত্তিটী স্থাপিত করিল। মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার দিন মণি বিস্তর অর্থব্যয় করিয়া অভ্যাগত নরনারীদিগকে ঠাকুরের প্রসাদ বিতরণ করিল। কেবল পায়স আর পুরী প্রসাদ পেট ভরিয়া লোকে খাইল।

তাহার পর মৃণালিনী গ্রামের গৃহিণীদিগকে ডাকিল। সকলকে যুক্ত কর হইয়া বলিল, "আপনারা জানেন, একমাত্র ভোলানাথ শিবের পূজারই স্ত্রীলোকের অধিকার। আমার আশুতোষ ঠাকুরের ত স্ত্রী শূদ্র ভেদ নাই। আমি আমার নারীর ঠাকুরকে নারীদিগের হাতে দিয়েই যেতে চাই। আমার ঠাকুরের পূজার পুরোহিত নারী। যা'র যখন অবকাশ হবে, তখনই তিনি আমার ঠাকুরের পায়ে এক অঞ্জলি পুষ্প আর মস্তকে একটী বিল্বদল দিয়ে যাবেন। যা'র যখন ইচ্ছা. এক অঞ্জলি জল আমার ঠাকুরের শিরে অঞ্জলি দেবেন। গ্রামের কুমারীরা আমার

ঠাকুর ঘর মার্জ্জনা করবে, সধবারা মন্দিরে দীপালোকে আরতি দেবেন, বিধবারা অর্চ্চনা করবেন। "নমঃ শিবায়" ব'লে ঠাকুরের শিরে ফল বিল্বদল দিতে কুমারী সধবা বিধবা, ব্রাহ্মণ শূদ্র কাহারও বাধা বিধি নাই। বরবধূরা আমার ঠাকুরের প্রণাম করে আশীর্ব্বাদ নিয়ে যাবে; পুত্রবতী আতুড় স্নান করে আমার ঠাকুরের নির্ম্মাল্য নিয়ে গৃহে যাবে। রোগী আমার ঠাকুরের পাদোদকে আরোগ্য স্নান করবে। আমার নারীর ঠাকুর! নারী যেন এঁকে অবহেলা না করেন।"

নলিনীরঞ্জন ঘর বাড়ী প্রস্তুত করিলে বলদেব তাহাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া মৃণালিনীকে বলিলেন, "চল মা, স্বামীর ঘরে যেতে হবে।"

মৃণালিনী ঠাকুর মন্দিরে গিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "যাই ঠাকুর! ঠাকুরের চেয়েও স্ত্রীলোকের স্বামী বড় ঠাকুর, তাই স্বামীর ঘরে যাই। প্রতিদিন আমার শৈলকে পাদোদক দিও,—"ওর বড় জ্বালা।"

সম্পূর্ণ।

গ্রন্থকারের নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি
আমরা প্রকাশ করিয়াছি।

১।	চারু চন্দ্র	(২য় সং)	১৲ টাকা
২।	অমৃতে গরল	(২য় সং)	১৲ ,,
৩।	সুভদ্রা	(২য় সং)	১৲ ,,
৪।	বন মালা	(২য় সং)	১৲ ,,
৫।	পাপিষ্ঠা	(২য় সং)	॥০ ,,
৬।	লক্ষ্মী মেয়ে	(৬ষ্ঠ সং)	১৲ ,,
৭।	লক্ষ্মী বউ	(৮ম সং)	১৲ ,,
৮।	লক্ষ্মী মা	(৫ম সং)	১৲ ,,
৯।	সতী লক্ষ্মী	(৩য় সং)	১৲ ,,
১০।	স্বয়ম্বরা	(২য় সং)	১৲ ,,
১১।	দীপালির বাজি	(নূতন উপন্যাস) ...	১।০ ,,
১২।	বিষের বাতাস	,, ,, ...	১।০ ,,
১৩।	কুলের বলি	(যন্ত্রস্থ)	১।০ ,,
১৪।	জ্যাঠাইমা	(যন্ত্রস্থ)	১৲ ,,

শ্রীগোবিন্দ সাহিত্য মন্দির
২৩।১, হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা।